দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

চীনকে ভাতে
মারতে হবে
— পৃঃ ৫

সেবাকাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক
সঙ্ঘের পরম্পরা
— পৃঃ ১৬

৭২ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ২২ জুন, ২০২০।। ৭ আষাঢ় - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

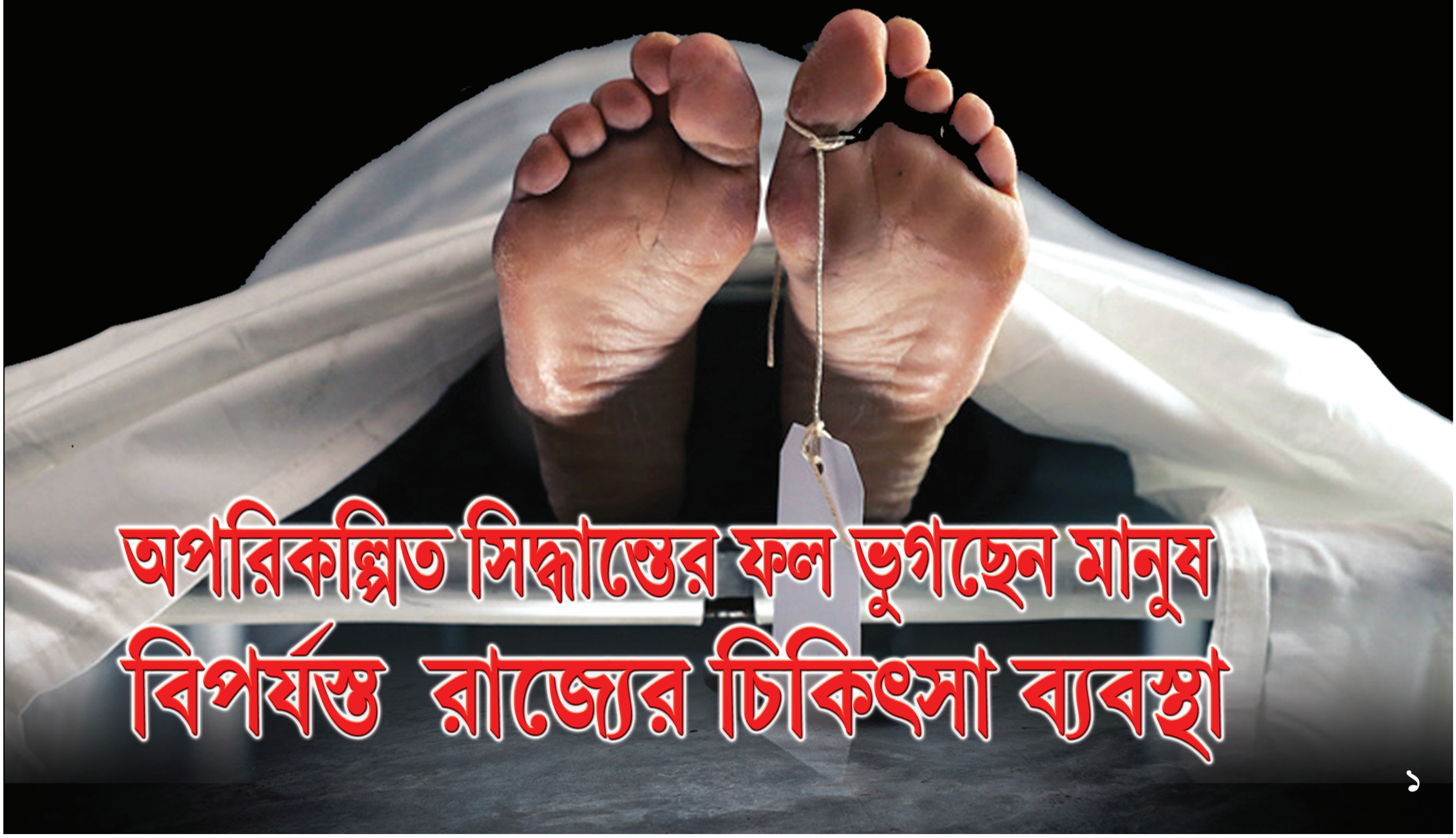

অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের ফল ভুগছেন মানুষ
বিপর্যস্ত রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

- ✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।
- ✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।
- ✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद हैं, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध हैं।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ৭ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২২ জুন - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

চীনকে ভাতে মারতে হবে ▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ৫

করোনার কারণে রাজ্যের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ▯ অধ্যাপক উচ্ছল কুমার ভদ্র ▯ ৭

মায়াবী মমতা আর করোনার করুণা ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ১০

মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে লাটে উঠেছে রাজ্যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ১৩

করোনার জন্য সংকুচিত রাজ্যের গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থা ▯ ডা: গৌতম মুখোপাধ্যায় ▯ ১৫

করোনা চিকিৎসার শুরু থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া উচিত ছিল ▯ ডা: প্রাঞ্জল রায় ▯ ১৫

সেবাকাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরম্পরা ▯ বিনয় বর্মন ▯ ১৬

ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতের আত্মাকে পদদলিত করেছিলেন ▯ অজয় সরকার ▯ ১৯

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার নতুন কৌশল ▯ ২১

চীনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতকে গণতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষ নিতে হবে। ▯ হর্ষ পন্থ ▯ ২৪

আক্রান্ত জগন্নাথদেব ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ২৬

একটি কৃষি উৎসব আজ শুধুই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ২৮

কামাখ্যা মহাপীঠের ইতিবৃত্ত ▯ জহরলাল পাল ▯ ৩০

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ ব্যর্থ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হইবার মাত্র এক বৎসরের ভিতর সদর্পে বলিয়াছিলেন, আমি নব্বই শতাংশ কাজ সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। আর মাত্র দশ শতাংশ কাজ বাকি রহিয়া গিয়াছে। এমন সদর্পে আস্ফালন ইতিপূর্বে আর কোনো মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় নাই। ভবিষ্যতেও হইবে কিনা সন্দেহ। ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নয়টি বৎসর সরকারে অতিক্রান্ত করিয়াছে। আগামী বৎসরেই তাহা দশম বর্ষ পূর্ণ করিবে। এই নয় বৎসরে এই রাজ্যের মানুষ দেখিতেছেন, ক্ষমতায় আসীন হইবার এক বৎসরের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সদর্পে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত বাস্তবের কোনোরূপ মিল নাই। সিন্ডিকেট রাজ্যের দাপট, চুরি এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি হওয়া ব্যতীত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালের এই নয় বৎসরে এমন কিছু ঘটে নাই যাহাতে জনজীবন উপকৃত হইতে পারে। বরং চৌত্রিশ বৎসরের বাম শাসন রাজ্যটিকে যে পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয় বৎসরের শাসনকালে সেই পঙ্কের আরও গভীরে নিমজ্জিত হইয়াছে রাজ্যটি। এই নয় বৎসরে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে গালভরা বুলি ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারেন নাই। অন্য সব ক্ষেত্র ছাড়িয়া যদি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের দিকেই নজর দেওয়া যায়, তাহা হইলে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার চিত্রটি প্রকট হইবে। ইহা অস্বীকার করা যাইবে না, পূর্ববর্তী বাম শাসকেরা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিয়া গিয়াছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসিয়া ঘোষণা করিবেন, কলকাতা-সহ জেলার সরকারি হাসপাতালগুলিকে তিনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করিবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাতারাতি সব সরকারি হাসপাতালগুলিকে নীল-সাদা রং করা হইল। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন ইহারা সব সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। করোনা মহামারীতে যখন সমগ্র দেশের সহিত পশ্চিমবঙ্গও আক্রান্ত হইল, তখন অবশ্য বুঝা গেল, মুখ্যমন্ত্রীর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আসলে নামেই সুপার স্পেশালিটি। বাহিরে নীল-সাদা রংটুকু হইয়াছে। ভিতরটা যথারীতি ফোঁপরা।

একটি সরকার কতখানি দক্ষ, সরকারের পরিচালকরা কতটা সুপ্রশাসক তাহা প্রমাণ হয় সংকটের সময়। করোনার সংকটে দেখা গেল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ডাহা ফেল। এই স্থানে ইহাও উল্লেখ করা ভালো যে, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। করোনা যখন পশ্চিমবঙ্গে থাবা বসাইল, তখন এই সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর প্রথমেই যে কাজটি করিয়াছিল, তাহা হইল, প্রকৃত তথ্য চাপিয়া যাওয়া। এবং এই উদ্দেশ্যেই ডেথ অডিট কমিটি নামক একটি অত্যাশ্চর্য কমিটি গঠন করিয়াছিল সরকার। পরে অবশ্য এই কমিটির যৌক্তিকতা নিয়া প্রশ্ন উঠিলে মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছিলেন—এই কমিটির বিষয়ে তিনি বিন্দুবিসর্গ জানেন না। মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে এমন একটি কমিটি গঠন করা হইবে—তাহা নিতান্ত শিশুও বিশ্বাস করিবে না। লকডাউন শুরুর পর্বে, যখন সরকারের উচিত ছিল বিভিন্ন সরকারি ভবনে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ভবনে আপৎকালীন ভিত্তিতে করোনা চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরি করা—তাহা করিল না সরকার। বদলে মুখ্যমন্ত্রী চকখড়ি হস্তে রাস্তায় নামিয়া আত্মপ্রচারের কাজে ব্যস্ত রহিলেন। ফল যাহা হইবার তাহা হইল। রোগীর তুলনায় অপর্যাপ্ত হইয়া পড়িল চিকিৎসা ব্যবস্থা। করোনা আক্রান্ত রোগীরা হাসপাতালের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে লাগিলেন। শুধু তাহারাই নন, ক্যান্সারে আক্রান্ত বা ডায়ালিসিস চলিতেছে এমন গুরুতর অসুস্থরাও সংকটে পড়িলেন। সরকারের প্রচারের বেলুনটি ফুটা হইয়া গেল।

রাজ্যের মানুষের জীবন লইয়া এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিনিমিনি খেলিতেছেন। তাহার মিথ্যাচার এবং তুঘলকি কার্যকলাপ রাজ্যটিকে যে বধ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে—তা রাজ্যবাসী বুঝিতে পারিয়াছে। যথাসময়ে রাজ্যবাসীই সসম্মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদায়ের পথ দেখাইয়া দিবে।

সুভাষিতম্

বাণী রসবতী যস্য, যস্য শ্রমবতী ক্রিয়া।

লক্ষ্মী দানবতী যস্য, সফলং তস্য জীবিতং।।

যাঁর মুখের ভাষা মিষ্টি, যাঁর কাজ পরিশ্রম যুক্ত, যাঁর ধন দান করার জন্য সংগৃহীত হয়—তাঁর জীবন সার্থক।

চীনকে ভাতে মারতে হবে

রঞ্জন কুমার দে

'Exit The Dragon' শিরোনামে চীনা পণ্যের বয়কটের ডাক দিয়েছে আমূল গার্ল, ট্যুইটারের কড়াকড়ি সত্ত্বেও 'চিনি কম করো' শিরোনামে। এর আগেও আমূল পাক-ভারত উত্তেজনায় 'pack up and leave!' শিরোনামে ট্যুইটারে আমূল গার্ল সরব হয়েছিল। পাকিস্তানের গোলার চাইতেও ভয়ংকর লাল চীন, তাদেরই পরোক্ষ মদতে পাকিস্তান নেপাল সীমান্ত এলাকায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। চীনকে চাপে রাখতেই প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলোকে অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য করে আসছিল ভারত। সম্প্রতি ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে থ্রি ইডিয়ট খ্যাত শিক্ষা সংস্কারক সোনম ওয়াংচুক এক ভিডিয়ো বার্তায় চীনের বুলেটের পরিবর্তে নাগরিকদের ওয়ালেটে জবাব দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারতের সূত্র ধরে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কার্যসূচিকে ভর করে চীনা দ্রব্য বর্জনে স্বদেশি জিনিসপত্র ব্যবহারে শামিল হতে বলেছেন। চীনা সরকারের মুখপত্র 'দ্য গ্লোবাল টাইমস' তাদের এক সম্পাদকীয়তে প্রকাশ করে, 'চীনা পণ্যে ভারতবাসীর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, তাই প্রতিবারের মতো চীনা পণ্য বর্জনের আহ্বান নিছক এক লোক দেখানো ও অরণ্যে রোদন।' বেশিরভাগ ভারতীয় গরিব ও নিম্নবিত্ত। সেই অনুযায়ী চীন অতি সূক্ষ্ম চিন্তাধারায় দাম ও চাহিদার জটিল শর্ত সহজেই পূরণ করে নেয়। তাই অন্য বহুজাতিক কোম্পানি ও ভারতীয় কোম্পানির তৈরি পণ্য গুণমানে ভালো হলেও অতিরিক্ত দামের সুবাদে সেই গ্রহণযোগ্যতা এখন পর্যন্ত আদায় করতে পারেনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাস ট্যাগ 'বয়কট চায়না'র যথেষ্ট জনপ্রিয়তা মিললেও চীনারা সেটাকে কেবল তাদের প্রতি অপমান, প্রতিশোধ মেটানো এবং দেশপ্রেমের হাওয়া তোলার এক কৃত্রিম মাধ্যম মনে করছে। মেড ইন ইন্ডিয়া বা মেক ইন ইন্ডিয়াতে ভারত যথেষ্ট এগিয়ে থাকলেও সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হতে নিঃসন্দেহে কিছুটা সময় তো লাগবেই। কারণ চীনা পণ্যের অনেক বিকল্প ভারত এখনো খুঁজে পায়নি, আর যেগুলো কিছুটা হলেও উৎপাদিত হচ্ছে তা চীনা পণ্যের সঙ্গে মোকাবিলায় পেরে উঠতে পারছে না। ইলেকট্রনিক জিনিস যেমন স্মার্টফোন, ক্যামেরা, ল্যাপটপ প্রভৃতি ভারতে উৎপাদিত হলেও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য চীনের উপরই ভরসা করতে হচ্ছে। তাছাড়া অজস্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, খনি শিল্পে ব্যবহার্য ভারী যন্ত্রাংশ, ছাতা, কলম, চশমা, ঘড়ি, ফেন্সি সামগ্রী, গাড়ি, খেলনা, মেশিন তৈরির অজস্র হার্ডওয়ার চীন থেকেই আমদানি করা হচ্ছে। সফটওয়ারের জগতেও চীনা অ্যাপ টিকটক, ইউসি ব্রাউজার ভারতে রমরমা। তবে চীনা পণ্য বয়কটের ডাকে 'রিমোভ চায়না' অ্যাপের মাধ্যমে চাইনিজ অনেক অ্যাপ বর্তমানে মোবাইল থেকে বাদ পড়েছে। চীনা সফটওয়ার ভারতীয়রা সহজে পরিত্যাগ করলেও তাদের হার্ডওয়ার পণ্য ত্যাগ করা এতো সহজতর নয়। চীনা দ্রব্য বর্জনে বৃহত্তর ভারতীয়দের প্রথমে স্বদেশি পণ্য ব্যবহারে প্রাথমিকতা এবং সরকারের উপভোক্তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশীয় পণ্যের কাঁচামালের জোগান, তার চাহিদা, দামে তীক্ষ্ণ নজর খুবই দরকার।

> **চীনা পণ্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা করেত হবে সমস্ত ভারতীয়কে। মনে রাখতে হবে, ভারতই চীনের বড়ো বাজার। চীনা দ্রব্য বর্জন করেই তাকে ভাতে মারতে হবে। আর ভাতে মারলেই তার চোখ রাঙানি বন্ধ হবে।**

প্রতিদিনের বিভিন্ন মিডিয়া হাউসের ভারত-চীন উত্তেজনার সংবাদে মানুষ হতভম্ব। অনেক মিডিয়া দাবি করছে দুই দেশের সীমান্তে সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম ক্রমশ আরও সুসজ্জিত হচ্ছে। কেউ বলছে চীন ভারতের কয়েক কিলোমিটার ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে। কোনো মিডিয়া বলছে উচ্চ স্তরের সেনা বৈঠকে সব ঠিক হয়ে আসছে ইত্যাদি। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের দুষ্ট প্রতিবেশী পাকিস্তানের দৃশ্য অদৃশ্য জঙ্গি কার্যকলাপ, সীমান্তে উত্তেজনা প্রভৃতি ভারত বিরোধী গতিবিধিতে চীন উস্কানি দিয়ে আসছিল। সম্প্রতি নেপাল চীনের পরোক্ষ মদতে পাকিস্তানি কায়দায় লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ গিরিপথ ও কালাপানি অঞ্চলের ভারত-ভূখণ্ডের ৪০০ বর্গকিলোমিটার দাবি করে তাদের সংসদে এক বিতর্ক নকশা অনুমোদন করেছে। এমতাবস্থায় প্রতিবেশী চীন ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকেই জাতীয় সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে হুমকি স্বরূপ। তাই তাদের অর্থনীতিতে লাগাম না টানতে পারলে বা ভারতের অর্থনীতি চীনের পর্যায়ে পৌঁছাতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের সেই মাশুল দিতেই হবে। চীন বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হলেও মাত্র কয়েক দশক আগে তারা ভারত থেকে পিছিয়ে ছিল। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত প্রতি ব্যক্তির আয় ১৫৫ মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতের ২১০ মার্কিন ডলার ছিল। বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র ৪ দশক আগে পর্যন্ত চীন ভারত থেকে প্রায় ২৬ শতাংশের বেশি গরিব ছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালের পর চীনের নীতি নির্ধারণের আমূল সংশোধনে তারা পৃথিবীর দ্বিতীয় অর্থনৈতিক

শক্তিশালী দেশ-সহ ভারত থেকে প্রায় ৫ গুণ ধনী দেশে পরিণত হতে পেরেছে। চীনের উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি ছিল ভূমি সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক বিস্তার এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ঈর্ষণীয় সাফল্য। এসব ক্ষেত্রে ভারত কিছুটা প্রভাব বিস্তার করলেও স্বাধীনতার পর থেকেই প্রায় প্রত্যেক সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ঘেরাটোপে পুরোপুরি সেটা ব্যর্থই হয়েছে।

চীনের অর্থনৈতিক সংশোধনী ১৯৭৮ সালে শুরু হলেও ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চীনের প্রতি ব্যক্তি আয় ৩৩১ ডলারের বিপরীতে ভারতের ৩০৯ ডলার ছিল। কিন্তু ২০১৫ সাল আসতে আসতে চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার দৌড়ে ভারত পুরোপুরি ছিটকে যায় অর্থাৎ ২৫ বছরের ব্যবধানে চীনের প্রতি ব্যক্তি আয় ৭৯২৫ ডলারের তুলনায় ভারত মাত্র ১৫৮২ ডলারের পৌঁছতে পারে যা চীনের থেকে প্রায় ২৪ গুণ কম। ১৯৭৮ সালের আগে চীনের অর্থনৈতিক কাঠামো এতোই দুর্বল ছিল যে দেশের ৯০ শতাংশ লোক খুব গরিব ছিল। শহরাঞ্চলে মাত্র ২০ শতাংশ মানুষের বসবাস ছিল কিন্তু ২০১৭ সালের পরিসংখ্যানে চীনের অর্থনৈতিক শেয়ার বিশ্ব অর্থনীতির বাজারে ১.৮ শতাংশ থেকে ১৮.২ শতাংশের দখল নেয়। আজ চীনের পরিচিতি পৃথিবীর সর্বোচ্চ শক্তিশালী বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডারের দেশের। জিডিপিতে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে, বিদেশি নিবেশকদের তৃতীয় আকর্ষিত বাণিজ্যিক কেন্দ্র চীন। ২০১৫ সাল পর্যন্ত চীনে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে আগের তুলনায় ১৭,৫০০ গুণ বৃদ্ধি পায়। চীনের পণ্য সহজলভ্য হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে চীনের শ্রমিক ভারতের তুলনায় প্রায় ১.৬ গুণ বেশি উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। ফলস্বরূপ তাদের উৎপাদনশীলতাও ভারতের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক বাজারে চীন-আমেরিকা সর্বদাই অহি-নকুল সম্পর্ক। আমেরিকা ইতিমধ্যে চীন থেকে তাদের ২০০টিও বেশি কোম্পানি গুটিয়ে ভারতে স্থাপনের চিন্তায় রয়েছে, সেই সঙ্গে আমেরিকায় চীনের কোম্পানিগুলো থেকে সর্বমোট আনুমানিক ৩০ হাজার কোটি ডলার অতিরিক্ত শুল্ক আদায়ের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। পরিণামের চিন্তা না করে চীনও আমেরিকান কোম্পানিগুলোর উপরে ৫ থেকে ২৫ শতাংশ কর বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র এক উদ্ধৃতিতে বলেছেন, 'ভারত এখন এক উদীয়মান শক্তি এবং ভারতে বিনিয়োগ চীনের থেকে বেশি সুরক্ষিত ও বিশ্বাসযোগ্য।' তাই চীনে স্থাপিত সমস্ত শিল্প, কারখানা ভারতে স্থানান্তরের একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তারা। ভারত কৌশলে আত্মনির্ভরশীলতার ডাকে স্বদেশি পণ্য ব্যবহারে চীনকে বয়কট করতে এবং সুসম্পর্কের আগাম বার্তায় আমেরিকার বাজারে ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলির জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই মুহূর্তে ভারত ৩০০টির বেশি মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী ইউনিট স্থাপন করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকা জি সেভেন সদস্যভুক্ত দেশে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করছে এবং ভারত-সহ ৮টি দেশকে এক জোট করে করোনা সংক্রান্ত মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে চীনকে ঘিরতে ইন্টার পার্লামেন্টারি অ্যালায়েন্স অন চায়না (আইপিএসি) গঠন করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে চীন ও পাকিস্তানকে মোকাবিলা করতে আমেরিকা অবশ্যই ভারতের সুপার বিকল্প। কিন্তু ভারত-আমেরিকার বন্ধুত্বকে চীন মোটেই ভালো চোখে দেখছে না। চীনা সরকারের মুখপত্র 'গ্লোবাল টাইমস' ভারতকে আমেরিকা থেকে দূরে থাকার সতর্কবার্তা দিয়েছে। অন্যথায় সীমান্ত, অর্থনৈতিক বাজার, আন্তরাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, সার্বভৌমত্বে ভারতকে চরম দুর্ভোগ পোহানোর হুমকি দিয়ে রেখেছে।

চীন নিজেদের দেশে উইঘুর মুসলমান, কাজখদের প্রতি চরম বর্বর হলেও পাকিস্তানের জৈশ-ই-মহম্মদের মাসুদ আজাহারদের প্রতি অত্যন্ত নরম মনোভাব পোষণ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থায়ী পরিষদের সবকটি দল মাসুদকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও চীন বার বার ভেটো প্রয়োগ করে পাক জঙ্গিটিকে বাঁচিয়ে দেয়। চীনের সামরিক, অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি সর্বোপরি ভারতের জন্য অশনি সংকেত। অথচ আমরাই চাহিদা, বিলাসিতায় পরোক্ষভাবে প্রতিদিন চীনের বাজার চাঙ্গা রাখছি। ইন্দো-চীনের বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলারের অর্থাৎ ৬ লক্ষ কোটি টাকার, যার মধ্যে ভারত প্রায় ৫ লক্ষ কোটির পণ্য আমদানির বিপরীতে মাত্র ১ লক্ষ কোটির পণ্য চীনে রপ্তানি করতে পারে। এই জানুয়ারি মাসে চীন ৪১,৫৯৬ কোটি মূল্যের পণ্য ভারতে রপ্তানি করেছে এবং ভারত মাত্র ১০,৪০০ কোটির। করোনা মহামারীতেও ফেব্রুয়ারি মাসে চীন ৭৯৯৯ কোটি মূল্যের পণ্য আমদানির বিপরীতে বিশাল ৩১,৭৬৪ কোটির রপ্তানি বাণিজ্য ভারতের সঙ্গে করতে সক্ষম হয়। চীনের উন্মুক্ত বাজার ভারত। চীন প্রতি বছর প্রায় ২.২৫ লক্ষ কোটির ইলেকট্রনিক জিনিস, ১০,০০০ কোটি মূল্যের চাইনিজ পুতুল, ১২০০০ কোটি মূল্যের সুতির কাপড়, ১৫০০০ কোটি মূল্যের ফেন্সি আসবাবপত্র প্রভৃতি পণ্য ভারতে রপ্তানি করে। তাই চীনের বাজার কেবল টিকটক, দীপাবলির চাইনিজ পণ্যে সীমাবদ্ধ নয় যে এগুলো বর্জন করলেই তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভারতে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। ২০১৭ সালেও এরকম ডোকলাম সীমান্তে ভারত-চীনের শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায় ভারতের কূটনৈতিক জয় হয়েছিল। প্রতিবেশী দেশগুলোকে আশ্বস্ত রাখতে অবশ্যই ভারতকে লাল চোখের মোকাবিলা সাহসিকতার সঙ্গে করতে হবে। চীনা পণ্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা করেত হবে সমস্ত ভারতীয়কে। মরসুমি আন্দোলনের মতো হুজুগ নয়, কঠোর ভাবে বর্জন করতে হবে চীনা পণ্য। এবারও সেলিব্রেটি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ জনগণ চীনা পণ্য বর্জনের খোলা চিঠি লিখছেন। উল্লেখ্য, সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির (WTO) বাধ্যবাধকতায় সরাসরি বিদেশি পণ্য বর্জনের কথা বলতে পারে না। এ কাজটি পুরো সমাজকেই করতে হবে। এবং তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভারতই চীনের বড়ো বাজার। চীনা দ্রব্য বর্জন করেই তাকে ভাতে মারতে হবে। আর ভাতে মারলেই তার চোখ রাঙানি বন্ধ হবে। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

করোনার কারণে রাজ্যের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

অধ্যাপক উচ্ছল কুমার ভদ্র

আমাদের দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এই প্রথম, কিন্তু করোনা ভাইরাস আগেও খবরে উঠে এসেছিল ২০০৩ সালে 'সার্স- করোনা ভাইরাস' এবং ২০১২ সালে মধ্যপ্রাচ্যে 'মার্স-করোনা ভাইরাস' নাম নিয়ে। সে দুটি একটু বেশিমাত্রায় সাংঘাতিক ছিল। যে ভাইরাস রোগীকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেরে ফেলে, তা বেশিদিন বংশবৃদ্ধি করতে বা ছড়াতে পারে না। তাই ওই অসুখগুলো পৃথিবীব্যাপী ছড়ানোর আগেই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান এই কোভিড-১৯ নতুন আর এক করোনা ভাইরাস। এর সংক্রমণ চীনা সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছিল ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে। ৩০ জানুয়ারি ২০২০-তে আমাদের দেশে এর প্রাদুর্ভাব তথা সংক্রমণ শুরু হয়।

ভারতের মতো বিশাল ও জনবহুল দেশে আক্রান্ত, সুস্থ হয়ে ওঠা ও মৃতের সংখ্যা কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশেষ ভীতিপ্রদ বা হতাশাব্যঞ্জক বলা চলে না। আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার হিসেবে ভারত বিশ্বে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে বলে খুঁত খুঁজে বেড়ানো খবরের মিডিয়াগুলো হৈচৈ করলেও জনসংখ্যার নিরিখে বিচার করলে এই মুহূর্তে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যায় ভারতের স্থান ১৩৭ নম্বরে! আর মৃত্যুর কথা ধরলে জসংখ্যার বিচারে ভারতের স্থান ১১৩ নম্বরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একদম সঠিক সময়ে লকডাউন না ঘোষণা করলে আমাদের অবস্থান যে ঠিক উলটো হতো, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এই রাজ্যে পদে পদে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করা হয়। সেই বিরোধিতার ফিরিস্তি দেবার পরিসর এই প্রতিবেদনে নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই রাজ্যে যে চরম নৈরাজ্য চলছে, তার অন্যতম কারণ এই অন্তঃসারশূন্য মোদী-বিরোধিতা। স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইট খুলে রাজ্যের স্বাস্থ্য-বিষয়ক তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, সেখানে প্রাপ্তব্য সর্বশেষ পরিসংখ্যান হলো ২০১৫-১৬ সালের একটি প্রকাশনা— হেল্‌থ অন দ্য মার্চ ২০১৫-১৬, যেটিতে ব্যবহৃত পরিসংখ্যান ২০১৪-রও আগের। বর্তমানের এই গতিশীল জগতে ঠিকঠাক এবং সময়োচিত পরিসংখ্যান না পেলে কোনো কর্মকাণ্ডই চলতে পারে না, কিন্তু এই রাজ্য তো শুধুমাত্র মুখের কথার ফুলঝুরিতেই চলছে, কাজে নয়!

ঠিক এই রকমের একটা ব্যাপারই ঘটেছে করোনার ক্ষেত্রেও। 'মহামারী বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করে 'এপিডেমিক ডিজিজেস অ্যাক্ট ১৮৯৭' অনুসারে দিল্লি থেকে লকডাউন ঘোষণা হলো, আর আমরা এই রাজ্যে কী দেখলাম? দেখলাম, অনুপ্রাণিত উপদেষ্টারা লকডাউনের গুরুত্ব তাঁকে যেমনটি বুঝিয়েছেন, সেই মতনই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দলবল নিয়ে সারা কলকাতা চষে বেড়িয়ে বাজারে রাস্তায় গোল্লা আঁকছেন। মানুষ ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে বাজার করবেন তা বোঝাতে। আর মানুষ ভিড় করে কৌতূহলের সঙ্গে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছেন। লকডাউনের মতো এমন একটি জরুরি ও অবশ্যপালনীয় বিষয়কে দিনের পর দিন এই রকম খেলো করে দেবার ফলশ্রুতি এই হয়েছে যে, রাজ্যের মানুষ লকডাউন বিষয়টা আদপেই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে পারেননি এবং না পেরে লকডাউন কার্যত ব্যর্থই করে দিয়েছেন। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। সংক্রমণ হু হু করে বেড়ে চলেছে, সেটা ঢাকার জন্য তাঁর উপদেষ্টারা সঠিক পরিমাণে টেস্ট করাননি, তাঁকে খুশি করার জন্য করোনায় মৃত্যুকে অন্য রোগে মৃত্যু বলে চালিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কম

দেখিয়েছেন। আমাদের একটিবারের জন্যও মনে হয়নি যে, একটা মহামারী পরিস্থিতিতে লকডাউনের আসল উদ্দেশ্য ঠিক কী, তাঁর উপদেষ্টাদের কারুর সেই বোধ বা উপলব্ধি আদৌ ছিল। মহামারী সর্বদাই অতীব দ্রুতগতি সম্পন্ন একটি বিপর্যয় , যা অত্যন্ত অল্প সময়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভরাডুবি করতে সক্ষম। লকাডউন তার বিরুদ্ধে লড়ার এক অতি প্রাথমিক অস্ত্র, যা সুচারুভাবে ব্যবহার করা হলে যে অতিরিক্ত সময় পাওয়া যায়, সেই সময়ের সুযোগে মহামারীর সঙ্গে যুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যবল, রসদ এই সমস্তই সুসংহত ও সঠিক স্থানে উপস্থাপিত করে ফেলে প্রস্তুতিপর্ব সেরে ফেলার কথা। যাতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নাগালের মধ্যেই রোগ ও রোগীর সংখ্যা রাখা যায়। সেই অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজটাই করা হয়নি।

এই চরম অদুরদর্শিতার যা প্রত্যাশিত ফল হবার কথা, ঠিক তাই হয়েছে। আজ একটা বেডের জন্য হাসপাতালে হাসপাতালে হাহাকার। আমরা সবাই দেখেছি, অ্যাম্বুলেন্স গায়ে লেখা থাকে : ‘সংক্রামক ব্যাধির জন্য নহে’। সংক্রামক ব্যাধির জন্য অ্যাম্বুলেন্স যদি না হয় তবে হাসপাতালগুলোই বা তা হবে কেন? আর তা যদি না হয়, তবে করোনা আক্রান্তরা যাবেন কোথায়? এই বিষয়টা যে চিন্তাভাবনা করে গুছিয়ে পরিকল্পনা করে রাখার কথা, তা করাই হয়নি। আজ রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলো ‘করোনা-প্যাকেজ’ নাকি দশ-বারো লক্ষ টাকা বা আরও চড়া দামে বিক্রি করছে, ভেন্টিলেটর দরকার হলে দর আরও বেশি। সরকারি হাসপাতালে বেড পাওয়া যায় না, যদিও রাজ্য সরকারের তথ্য অনুসারে কোভিডের জন্য রাখা বেডের ব্যবহারের হার নাকি ২৩.৯২ শতাংশ, অর্থাৎ প্রচুর বেড খালি রয়েছে, কোনো চিন্তা নেই। ডাক্তার-সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা সুরক্ষা-ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে দলে দলে করোনায় সংক্রমিত হয়ে কোয়ারেন্টিনে চলে যাচ্ছেন, যার ফলে হাসপাতালের দপ্তরের পর দপ্তর, ওয়ার্ডের পর ওয়ার্ড বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। ফলে এমনিতেই যে ব্যবস্থার ভাঁড়ে মা ভবানী, তাতে পরিষেবা সংকোচনের ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

‘অসুখ হয়েছে, পর্যাপ্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থা নেই’ এই রকমের পরিস্থিতি অবশ্য রাজ্যে নিতান্তই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু করোনার চিকিৎসা করতে গিয়ে অন্যান্য পরিষেবার কী হাল? এই মুহূর্তে রাজ্যে শুধুমাত্র করোনার চিকিৎসার জন্য ৬৯টি হাসপাতালকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ওই হাসপাতালগুলো নিশ্চয়ই খালি পড়ে থাকতো না? তবে করেনার প্রাদুর্ভাবের আগে যে রোগী সেখানে ভর্তি হতেন বা চিকিৎসা পেতেন, তাঁরা কোথায় গেলেন? নাকি সেই সমস্ত অসুখ আর হয়ই না?

আমাদের দেশে যে রোগগুলো সাধারণত হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে প্রথম ১৫টি রোগ হলো : (১) হৃদ্‌রোগ, (২) মস্তিষ্কের স্ট্রোক, (৩) আত্মহনন, (৪) ফুসফুসের সংক্রমণ, (৫) দাস্ত, (৬) শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ, (৭) দুর্ঘটনা, (৮) প্রসব-সংক্রান্ত অসুখ, (৯) যক্ষ্মা, (১০) রেচনতন্ত্রের অসুখ, (১১) এইডস, (১২) নবজাতকের অসুখ, (১৩) মধুমেহ (ডায়াবেটিস), (১৪) জলে ডোবা, (১৫) নবজাতকের মস্তিষ্ক-প্রদাহ।

তাহলে এই অসুখগুলো কোথায় গেল? এও কি সম্ভব যে আজ

শুধু অদূরদর্শী পরিকল্পনাহীনতার জন্য আজ রাজ্যে চলছে চিকিৎসার চরম অব্যবস্থা। শুধুমাত্র করোনার চিকিৎসার জন্য যে ৬৯টি হাসপাতাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ১৬টি সরকারি। অর্থাৎ সম্বলহীন, সঙ্গতিহীন মানুষ, যাঁদের অসুখ হলে একমাত্র গন্তব্য সরকারি হাসতাপাল, যেখানে এমনিতেই পরিষেবার বাতি টিম টিম করে জ্বলছে, সেখানে এই রকম পরিস্থিতিতে আরও ১৬টি হাসপাতাল কমে গেল। রাজ্যে করোনার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ৮,৭৮৫টি বেড। এই বেডগুলো কি করোনার জন্য নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে? মোটেই তা নয়। মোট হাসপাতাল-বেডের সংখ্যা থেকে ছেঁটে ওই বেডগুলো করোনা রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

করোনা মহামারী এসেছে বলে ওই সমস্ত অসুখ বিদায় নিয়েছে? কারুরই আর হৃদরোগ হচ্ছে না? কারুর আর মস্তিষ্কের স্ট্রোক হচ্ছে না? কেউ আর শ্বাসকষ্টে ভুগছেন না? কোনও শিশুর আর দাস্ত অর্থাৎ ডায়রিয়া হচ্ছে না?

এশিয়ার প্রথম ডাক্তারি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ১৮৩৫ সালে স্থাপিত বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ, সারা ভারতের গর্ব কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ আজ করোনা হাসপাতাল। সেখানে অন্য সমস্ত রোগের চিকিৎসা, ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠন সমস্তই লাটে উঠেছে। কর্তাব্যক্তিদের কে বোঝাবে, শীর্ষ ডাক্তারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে কখনও এইরকম 'ধর তক্তা মার পেরেক' ভঙ্গিতে একটিমাত্র অসুখের হাসপাতাল করে দেওয়া যায় না। বহু ক্যান্সারের রোগী সেখানে নিয়মিত চিকিৎসা পেতেন। বহু ডায়াবেটিস রোগী, বহু হৃদ্‌রোগের রোগী, অন্যান্য বিভিন্ন স্পেশ্যালিটি বা সুপারস্পেশ্যালিটি বিভাগে হাজার হাজার লোক সেখানে রোজ দেখাতে আসতেন। প্রতি বছর ওই হাসপাতালে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এমবিবিএস পাঠক্রমে ভর্তি হয়, সেখানে বহু স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনো করেন। প্রতিদিন হাজার হাজার ল্যাবরেটরি টেস্ট হয়, এক্সরে বা ইসিজির মতো জরুরি পরীক্ষা নিরীক্ষা বহু গরিব রোগী বিনে পয়সায় করান। তাঁদের সবার কী হবে? আছে কি কোনও পরিকল্পনা? যে মেডিক্যাল কলেজে দৈনিক ১২০০০ মানুষের পদার্পণ ঘটতো, সেটি আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

পূর্ব ভারতের সংক্রামক রোগের চিকিৎসার অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আই-ডি হাসপাতালে দৈনিক গড়ে ৯৫টি অ্যানিম্যাল বাইট (প্রধানত কুকুরের কামড়ের রোগী) আসত। এপ্রিল মাস থেকে আসছে দৈনিক গড়ে ১১ জন। এর অর্থ কি এই যে, কুকুর আর কামড়াচ্ছে না? আর এই কথা বললেও তো চলবে না— রাজ্যে লকডাউন এতই গুরুত্ব দিয়ে পালন করা হয়েছে যে কুকুর আর কামড়ানোর লোক পাচ্ছে না। এসব কথা বললে কুকুরগুলোও হাসবে! রাজ্যের এতই উন্নতি হয়ে গেল? তা যদি না হয় তবে এই প্রয়োজনীয় পরিষেবা যাঁদের দরকার, তাঁরা কী অবস্থায় আছেন? এই আই-ডি হাসপাতাল রাজ্যের একমাত্র সংক্রামক রোগের চিকিৎসার শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা সপ্তাহে সাত দিন রোজ চব্বিশ ঘণ্টাই পরিষেবা দেয়। কিন্তু এই হাসপাতালটিতে না আছে স্থায়ী বিশেষজ্ঞ বা ন্যূনতম সংখ্যক চিকিৎসক, না আছে পর্যাপ্ত নার্সিং স্টাফ। এই প্রতিবেদক ওই হাসপাতালের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বহু চেষ্টা করেছিলেন এখানে সংক্রামক রোগের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু করার জন্য, যাতে করে রাজ্যে ডাক্তারি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের এবং ন্যূনতম পরিষেবার চরম অভাবের কিছুটা সুরাহা হতে পারে, কিন্তু দেখা গেছে কর্তৃপক্ষের পরিষেবা উন্নয়নের বিষয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আজ হঠাৎ করে একটা সংক্রামক রোগের মহামারী নয়, প্যানডেমিক অর্থাৎ বিশ্ব-মহামারী আবির্ভূত হয়ে এই কূপমণ্ডুকদের পরিকল্পনাহীনতা একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সংক্রামক রোগের চিকিৎসা, গবেষণা, পঠনপাঠন ইত্যাদির যে বিপুল প্রয়োজন বর্তমানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, যার সুচারু ব্যবস্থা আমাদের দেশের অন্যান্য রাজ্যে এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে অবশ্যই রয়েছে, সেই কথা যে কোনও দায়িত্বশীল ও বিচক্ষণ প্রশাসক বুঝবেন, কিন্তু এই রাজ্যের অভিধানে দায়িত্বশীলতা ও বিচক্ষণতা এই দুটো শব্দের কোনওটারই অস্তিত্ব নেই। মহামারী মাসে মাসে হয় না, প্যানডেমিকও ফি-বছর ঘুরে ঘুরে আসে না। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিকাঠামো-যুক্ত সংক্রামক রোগের একটি শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে রাজ্যে অবশ্যই থাকা উচিত, সেই বোধবুদ্ধি রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তাদের নেই। এখানে তোড়জোড় চলে সংক্রামক রোগের এই সুবৃহৎ হাসপাতালটিকে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের মতো ছোট্ট ও অঞ্চলভিত্তিক একটা দপ্তরের পঠনপাঠনের ছাতার তলায় নিয়ে যাবার। অতীতে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের অসুবিধের দিনগুলোতে পৃথিবীর ট্রপিক্যাল অঞ্চলে বিশেষ কিছু আঞ্চলিক সংক্রমণজনিত অসুখের পঠনপাঠন হতো এই ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিষয়টিতে। কিন্তু আজকের সুপারসোনিক জেট আর হাইস্পিড ইন্টারনেটের গতিশীল যুগে সারা বিশ্বে এখন ওই সমস্তই সংক্রামক রোগের পঠনপাঠনে পড়ানো হয়, ট্রপিক্যাল মেডিসিনের মতো একটি বিলীয়মান ও ক্ষুদ্র পরিসরে নয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এসব কথা শোনার ও বোঝার লোক নেই।

বিষয়টা হচ্ছে এই যে, আজ করোনা সমস্ত অসুখকে পেছনে ফেলে সামনের সারিতে এগিয়ে এলেও অন্যান্য সব অসুখই যেমন ছিল তেমনই আছে। শুধু অদূরদর্শী পরিকল্পনাহীনতার জন্য আজ রাজ্যে চলছে সেই সমস্ত অসুখের চিকিৎসার চরম অব্যবস্থা। শুধুমাত্র করোনার চিকিৎসার জন্য যে ৬৯টি হাসপাতাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ১৬টি সরকারি। অর্থাৎ সম্বলহীন, সঙ্গতিহীন মানুষ, যাঁদের অসুখ হলে একমাত্র গন্তব্য সরকারি হাসতাপাল, যেখানে এমনিতেই পরিষেবার বাতি টিম টিম করে জ্বলছে, সেখানে এই রকম পরিস্থিতিতে আরও ১৬টি হাসপাতাল কমে গেল। রাজ্যে করোনার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ৮,৭৮৫টি বেড। এই বেডগুলো কি করোনার জন্য নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে? মোটেই তা নয়। মোট হাসপাতাল-বেডের সংখ্যা থেকে ছেঁটে ওই বেডগুলো করোনা রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যে শুধু রাজনীতি করলেই চলে, কাজ করতে হয় না। বেশ কিছুদিন আগে এবিপি আনন্দের মতো অনুপ্রাণিত টিভি চ্যানেলের এক সাংবাদিকের প্রিয়জনকে নিয়ে বেডের খোঁজে এ-হাসপাতাল ও-হাসপাতাল ঘোরার দুঃসহ অভিজ্ঞতার খবর আমরা সম্প্রচারিত হতে দেখেছি। তাতে ভাষ্যকার বলেছিলেন, পরিস্থিতি যে এতই সাঙ্ঘাতিক, নিজের রোগী নিয়ে না ঘুরলে তা তাঁরা জানতেই পারতেন না। সত্যি, কতটা অনুপ্রাণিত হলে পরে একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের চোখ আর ক্যামেরার লেন্স কিছুতেই দেখতে পায় না দিনের পর দিন একটু চিকিৎসার জন্য হন্যে হয়ে ঘোরা সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক হয়রানি! এই হচ্ছে এই রাজ্যের প্রকৃত চিত্র। করোনা-পূর্ব দুরবস্থার গোদের ওপর করোনার বিষ ফোঁড়ার ঘায়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে, আর তারা অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে— ২০২১ আর কতদূর?

(লেখক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ)

মায়াবী মমতা আর করোনার করুণা

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যপরিকাঠামো রুগ্ন হতে হতে এখন কোমায় পৌঁছে গেছে। আজ হাসপাতালে রাজনীতিকরণ, সংখ্যালঘু তোষণ, ব্যক্তিগত লাভ আর স্বজনপোষণ নীতির কারণে রাজ্যবাসীকে তার খেসারত দিতে হচ্ছে। নীল-সাদা রঙের সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালগুলি চোখে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবার নামমাত্র নেই।

ডাঃ আর এন দাস

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শুধু বিজেপি নয়, বিপক্ষের কংগ্রেস আর কমিউনিস্টরাও এখন খেপে গেছে। নির্বাচনের সময় অবশ্য শেষোক্তো দুই সংখ্যালঘু ভোট-ভিখারি পার্টি, মমতার ব্যানার্জির সঙ্গে হাত মিলিয়ে অমিত শাহর গতিরোধ করে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর ষড়যন্ত্রে অবশ্যই শামিল হবে। এখন জনগণের পালস বুঝতে পেরে গেছে সব পার্টিই। তাই পাবলিক সেন্টিমেন্টে শুড়শুড়ি দিয়ে মমতার বিরুদ্ধে রয়েসয়ে কথা বলছেন সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, অকারণে ১০০০ কোটির বেশি টাকা ক্লাবগুলিকে দেওয়ার কারণ ২০২১-এর নির্বাচন। কিন্তু ওই টাকায় অনেক বেকারকে রোজগার দেওয়া যেত। সরকারি আমলাদের খরচা থেকে অনেক টাকা বাঁচিয়ে 'করোনা'কে কাবু করা যেত! ভোটে ভয় দেখানো, রিগিং, ধর্ষণ, লুঠ আর পেশীশক্তির প্রয়োজন আছে যে! তাই মাস্তান পোষা আর কী!

মুখ্যমন্ত্রী সব ব্যাপারেই নেতিবাচক উক্তি আর প্রত্যাখানের প্রবৃত্তি। মোদী বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই কিন্তু তাঁর সর্বনাশের শুরু। কেজরিওয়ালও ঠিক সেই পথেরই দিশারি ছিলেন কিন্তু শাহিনবাগ আর শার্জিল ইমামের গ্রেপ্তারির পর থেকে এখন অনেক সংযত হয়েছেন। ন' বছর পূর্বে নবান্নে পৌঁছেই তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন পরবর্তী নির্বাচনের জয়কে নিশ্চিত করা আর ভোটারের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলছেন, দিদি ধর্মীয় শুড়শুড়ি দিয়ে নির্বাচন জিততে চান। তাই দুর্গাপূজায় প্রতিটি ক্লাবকে ১০ হাজার টাকা অনুদান এবং হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে মুয়াজ্জিনদের মাসিক ৩৫০০ টাকা বেতন দিয়েছেন। স্কুল শিক্ষক এবং সরকারি কর্মচারীরা মাইনে পাচ্ছেন না। কিন্তু স্বাস্থ্যবাজেট থেকে টাকা সরিয়ে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য বেআইনি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা— এইগুলিই তাঁর কাজ। মুখ্যনন্ত্রী ২৩ ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয় যাতে, আইবি অফিসার অঙ্কিত শর্মাকে আম আদমি পার্টির বিধায়ক তাহির হুসেনের বাড়ির সামনের ড্রেনে পাওয়া গিয়েছিল, তার জন্য দিদি মোদীকেই দায়ী করেন। মোদীই নাকি 'করোনা মহামারীর আতঙ্কের গুজব' ছড়িয়ে এই দাঙ্গা লাগান।

ডেঙ্গু ভাইরাস জ্বরকে নিরাময় করা যায় এডিস মশা নিবারণের মাধ্যমে। করোনা ভাইরাস কাউকেই করুণা দেখায় না। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, ভারতের প্রতিটি রাজ্য এমনকী সারা বিশ্ব আজ করোয়ায় আক্রান্ত। কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র উপায় সংক্রমণের পথগুলি অবরোধ করে দেওয়া, যাতে করে একজন থেকে অন্য জনের শরীরে সংক্রমণ পৌঁছতে না পারে। এর কোনো ভ্যাকসিন বা ভাইরাস ধ্বংসের নির্দিষ্ট ওষুধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

আজকের জগতের অপরিহার্য ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দুর্দশাগ্রস্ত হাসপাতালগুলির পরিকাঠামোর কঙ্কালসার জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট হলো। প্রসিদ্ধ নিউরোসার্জেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ঘোড়ই, চেস্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ অরুণাচল দত্তচৌধুরী ও কাটোয়ার সার্জেন ডাঃ স্বপন নায়েকের অপমানের কথা আমরা অনেকেই

জানি। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ একজন ক্যানসার বিশেষজ্ঞকে ধারা ১৫৩-এ আটক করেন। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি অপ্রতুল পিপিই, হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সের দৈহিক নির্যাতন, নিরাপত্তার অভাব এবং স্বাস্থ্যবিভাগের ঔদাসীন্যতার কথা তার মোবাইল থেকে ভিডিয়ো করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন। ধারা ১৫৩ মানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর মামলা যাতে ১ বছর সশ্রম কারাবাস ও জরিমানা দিতে হয়। শেষে হাইকোর্টের আদেশে তাঁকে ছেড়ে দিলেও তাঁকে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করানো হয়, তাঁর প্রথম টুইটটি ভুল ছিল আর দ্বিতীয় টুইটে মমতাময়ী স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করোনার মোকাবিলা করে চলেছেন তার কথা। এটা লিখতে বাধ্য তাঁকে করানো হয়। প্রচারের পর পুলিশ তাঁর দামি স্মার্টফোনটি বাজেয়াপ্ত করে।

সিপিএমের ৩৪ বছর আর দিদির ৯ বছরে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যপরিকাঠামো রুগ্ন হতে হতে এখন তা কোমায় পৌঁছে গেছে। আজ হাসপাতালে রাজনীতিকরণ, সংখ্যালঘু তোষণ, ব্যক্তিগত লাভ আর স্বজনপোষণ নীতির কারণে রাজ্যবাসীকে তার খেসারত দিতে হচ্ছে। নীল-সাদা রঙের সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালগুলি চোখে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবার নামমাত্র নেই।

মার্চের মধ্যেই আইসিএমআর মানে অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থান কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য সরকারি অনুদানে এসএসকেএম ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ১০০০টি টেস্টকিট, ট্রপিক্যাল মেডিসিন, মেদিনীপুর ও নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে ২০০টি করে টেস্টকিট পাঠিয়েছিল।

২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী 'জনতা কার্ফু'র ডাক দিয়েছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবালবৃদ্ধ বণিতা তা পালন করেছে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি তাকে বানচাল করার জন্য আলু ও চাল বিতরণের খেলা খেলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিকদের অসুবিধার কথা ভেবে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র বা অন্য প্রদেশে দীর্ঘদিন আটকে থাকা ২ লক্ষ শ্রমিক, তাদের প্রিয়জনের কাছে ফিরতে পারেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখানোয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে কড়া চিঠি লিখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

২৩ মার্চ, কেন্দ্রকে দোষারোপ করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রধান সচিবকে দিয়ে প্রেসবিজ্ঞপ্তি করিয়ে বলালেন, কেন্দ্র রাজ্যকে মাত্র ৪০টি টেস্টকিট দিয়েছে। উত্তরে, বেলেঘাটার আইডি হসপিটালের বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, পর্যাপ্ত পরিমাণ টেস্টকিট থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় ১০ শতাংশের কম ব্যবহৃত হয়েছে রাজ্যের পাঠানো নমুনার অভাবে।

২৪ মার্চ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাজ্যবাসীর জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধনকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অতি শীঘ্রই পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান। 'স্বরাজ্য মাগাজিন' থেকে জানা যায়, ২৩ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে মাত্র ২৯৭ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ১টি টেস্টকিটে ৭০-১০০টি নমুনা পরীক্ষা করা যায় অর্থাৎ ৪০টি টেস্টকিটে কম করেও ৩০০০ নমুনা পরীক্ষা করা যেতে পারতো কিন্তু তা হয়নি। সুতরাং মিথ্যা দোষারোপ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩ এপ্রিল তিনি আদেশ দিলেন, ডাক্তাররা ডেথ সার্টিফিকেট নয়, খসড়া মাত্র লিখতে পারবেন। ডেথ সার্টিফিকেট দেবেন ঠাণ্ডা ঘরে বসা এক্সপার্ট কমিটি। সেই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন ডাঃ সুকুমার মুখার্জি যাঁর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্ট কোনো একসময় ১.৫ কোটি টাকা জরিমানা করেছিল।

৫ এপ্রিল মুখ্য সচিব আবার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন, সরকার করোনা রোগীর পরীক্ষা, সংক্রমণের হিসাব, হাসপাতালে ভর্তি বা মৃতের সংখ্যার ব্যাপারে কোনোরকম প্রতারণা বা কারচুপি করেনি। এ যেন ঠিক ঠাকুরমার, 'ঠাকুর ঘরে কে রে?' আর নাতির তৎক্ষণাৎ সাফাই, 'আমি তো কলা খাইনি'। জনতা কি চালাকিটা বুঝবে না!

রাতের অন্ধকারে মৃতের দেহ হয় জ্বালানো নয়তো কবর দেওয়া হচ্ছিল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন অনুযায়ী করা হচ্ছিল না, কারণ তাতে মুসলমানদের ধর্মীয় আঘাতে ঘা দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক হারাতে তিনি রাজি নন।

১১ এপ্রিল রাজ্যের সমস্ত ডাক্তার সম্মিলিত ভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। অনুরোধ করেন, বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী বিষয়ে সঠিক, স্বচ্ছ ও প্রমাণসাধ্য পরিসংখ্যান দিতে। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে, সমস্ত রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা ও কল্যাণের কথা বিবেচনা করে শীঘ্রই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে।

১০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের প্রধানসচিব আর পুলিশের মহাপরিচালককে চিঠি দিয়ে বলেন, মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজার, নারকেলডাঙ্গা, তপসিয়া প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে লকডাউন মানা হচ্ছে না। এতে করে সমস্ত রাজ্যবাসীকে করোনার করাল গ্রাসে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তর, 'লকডাউনের মানবিক মুখের' কথা চিন্তা করে ওইসব অঞ্চলকে লকডাউনের বাইরে রাখা উচিত।

১৩ এপ্রিল আইসিএমআর-এর বেলেঘাটাস্থিত শাখা- পরীক্ষাগারের এনআইসিইডি-এর বিজ্ঞানীরা আবারও বললেন, 'কেন্দ্র সরকার আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ টেস্টকিট পাঠিয়েছেন কিন্তু রাজ্য সরকার পরীক্ষার জন্য এখনও নমুনা পাঠাচ্ছে না। শেষমেষ সরকারের অনুদানপুষ্ট একটি পত্রিকাকে পর্যন্ত লিখতে হলো, হতাশাগ্রস্ত মমতার ব্যর্থতার কথা-- 'অনেক হয়েছে আর না!'

২০ এপ্রিল আইএমএ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করলেন, 'তিনি যেন দয়া করে প্রতিদিন স্বাস্থ্য বুলেটিনের মাধ্যমে রোগী, তাদের পরিজন, হাসপাতালের কর্মচারী, সংক্রামিত ডাক্তার ও নার্সদের সম্বন্ধে সরকারি তথ্য প্রকাশ করুন। পর্যাপ্ত পরিমাণ পিপিই, স্যানিটাইজার ইত্যাদি সরবরাহ, সন্দেহভাজন সমস্ত রোগীর এবং তাদের সংস্পর্শে আসা সকলের কোভিড-১৯-এর পরীক্ষা অনিবার্য করুন।'

২০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধনের প্রেরিত আইএমসিটি অর্থাৎ ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল সেন্ট্রাল টিমের সঙ্গে কোনো রকমের সহায়তাই করেনি রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্য সচিব প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে

বলেছিলেন, 'ওই দলের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গে ছুটি উপভোগ করতে এসেছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে বসে সময় নষ্ট করতে পারি না'। পাঠানো চারটি চিঠির উত্তর না দেওয়ার কারণ হিসাবে বলেন, তিনি নাকি ভীষণ ব্যস্ত।

২৪ এপ্রিলের পর মানে আইএমসিটির পরিদর্শনের পর লাভ অবশ্য একটা হয়েছিল। কম করে দেখানো টেস্টকিট, পরীক্ষিত ও করোনায় মৃত ব্যক্তির সংখ্যা হঠাৎ করে লাফ দিয়ে রাতারাতি ৪ থেকে ৬ গুণ বেড়ে যায়। এটা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, প্রথম থেকেই কেন তিনি কেন্দ্রীয়দলের পরিদর্শনের ঘোর বিরোধিতা করে এসেছিলেন। আসল সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে মিথ্যার মোড়কে সংবাদ পরিবেশন করার কী প্রয়োজন ছিল? বিরোধীরা বলেন, জামাতি ভাইদের দুষ্কর্মকে ঢাকা দেবার জন্য, রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, তার পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা, ঔদাসীন্য আর অযোগ্যতাকে চাপা দেবার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী এ কাজ করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। চিরদিনের অভ্যাস মতো পুলিশের ভয় দেখিয়ে, খুন করে, ধর্ষণ করে, মিথ্যা মামলা ঠুকে, গাঁজা কেস দিয়ে, মুসলমান আর কামুক মাওবাদীদের দিয়ে কতদিন রাজত্ব টিকে রাখা যাবে?

২৮ এপ্রিল হাওড়ার বেলিয়াস রোডে আর টিকিয়াপাড়া থানাতে জিহাদিরা টাইমস অব ইন্ডিয়া টিভির সাংবাদিক আর পুলিশের ওপর বোমা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে মুখ্যমন্ত্রী 'সবাইকে দেখে নেব' বলে হুংকার দেন।

১০ মে মহারাষ্ট্রের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, কেন্দ্র সংক্রমণের ভয় জেনেও, ৭টি ট্রেনে পরিবার-সহ অসংখ্য বাঙ্গালি শ্রমিককে পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে সাহায্য করেছেন অথচ তিনি তাদের ঘরে ফেরার কোনো সুব্যবস্থা করতে পারেননি। অমনি মমতা ব্যানার্জি চিৎকার করে প্রধানমন্ত্রীকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন এই বলে, রেল স্টেশন থেকে নেমে বাড়ি ফেরার বাসের ব্যবস্থা কেন তিনি করেননি। কেন মোদী ট্রেন চালানোর সময় মমতার পরামর্শ নেননি।

করোনাকে সংক্রমণ রুখতে করতে মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রের কাছে ৫০,০০০ কোটি টাকার দাবি করছেন। অথচ কেন্দ্রপ্রেরিত ৬ জনের আইএমসিটির সঙ্গে কোনো সহযোগিতাই করলেন না। যখন ১৬ মে ২৬০ কিলোমিটার বেগের ঘূর্ণিঝড় আমফান ৮৪ জনের অকাল মৃত্যু ডেকে আনল, সে সময় প্রধানমন্ত্রী রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল পরিদর্শন করে ১০০০ কোটি টাকা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন। প্রতিটি মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ আর আহতকে ৫০ হাজার টাকার সাহায্য দেন।

করোনাকে সংক্রমণ রুখতে করতে মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রের কাছে ৫০,০০০ কোটি টাকার দাবি করছেন। অথচ কেন্দ্রপ্রেরিত ৬ জনের আইএমসিটির সঙ্গে কোনো সহযোগিতাই করলেন না।

কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী বলেছেন, করোনা মহামারীর অনেক আগে থেকে রাজ্য সরকার ঋণের ফাঁদে আঁটকে পড়েছে। স্বাস্থ্যবাজেট সংকোচন করে নিজের বিজ্ঞাপন খাতে খরচ করার জন্যই আজকের এই সমস্যা। কেন্দ্রকে দোষারোপ করে কী হবে? ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি বাজেট ম্যানেজমেন্টের আইন অনুযায়ী কোনো রাজ্য যদি ৩ শতাংশের বেশি রাজস্ব ঘাটতি দেখায় তবে তাকে আর ঋণ দেওয়া যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সেই সীমাকে তার জন্য বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হোক। বুঝুন ঠেলা এবার!

ডিএনদে কলকাতা আর মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এবং মহেশ ভট্টাচার্য আয়ুর্বেদিক কলেজ ছাড়াও প্রাইভেটে অ্যাপেলো, বেলভিউ ও কেপিসি মেডিক্যাল কলেজকেও করোনা হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে। ভারতে পুনার মাইল্যাব, ভুপালের কিলপেস্ট অব ইন্ডিয়া আর গোয়ার মেডসোর্স ওজোন বছরে একশো কোটি টেস্টকিট তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ দেশের প্রধান মন্ত্রী প্রস্তুত, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নন।

ভারতে একশো তিরিশ কোটির বিপুল জনসংখ্যা। সবারই পরীক্ষা তো আর করা যাবে না। সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া বা জার্মানির মতো সাফল্য না পেলেও, মোদীর মহতি প্রচেষ্টায় প্রতি ১০ লক্ষে ১৪৯ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ভারত। সারা দেশে আইসিএমআর নির্দেশিত সরকারি ৭২টি আর প্রাইভেট ১৬৬টি কোভিড-১৯ পরীক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ, এসএসকেএম, ট্রপিক্যাল মেডিসিন, মেদিনীপুর আর উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে কোভিড-১৯ পরীক্ষা হচ্ছে। এছাড়া আরও অনেক বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে করোনার পরীক্ষা হচ্ছে। মার্চে প্রতিদিন ৩ হাজার পরীক্ষা হতো। সেটা এপ্রিলে ২১ হাজারে পৌঁছায়। অধিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিদেশের রোস, সিমেন্স প্রভৃতি কোম্পানি থেকেও টেস্টকিট আনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে কেউ খুশি করতে পারবে না। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি! দুর্যোধনেরও ছিল ঠিক এইরকম গোয়ার্তুমি আর অহংকার। 'অন্যায়েন অর্থ সঞ্চয়ন, অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতা'। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে সকল রাজ্যবাসীর সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শরণাপন্ন হয়ে কেন্দ্রের অনুদান নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড মেনে রাজ্যকে করোনার কবল থেকে মুক্ত করুন, এই আবেদনই করছি। আর 'শারদদেবী সরস্বতী মতিপ্রদে'র কাছে এই প্রার্থনা করছি, যেন বাগদেবী 'কটুভাষিণীর জিহ্বাগ্রে' বসে একটু মধুর বচন এবং সৎবুদ্ধি দিন। ■

মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে লাটে উঠেছে রাজ্যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা

বিশ্বপ্রিয় দাস

একটি প্রশ্ন দিয়ে আজকের লেখাটা শুরু করতেই হচ্ছে। কী সেই প্রশ্ন? প্রশ্নটা হচ্ছে, আমাদের জনসাধারণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কি কারোর আছে? বিশেষ করে রাজ্যের অভিভাবকের? এখানে অভিভাবক শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে একটিই কারণে, সাধারণ মানুষ সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়ে তাঁকে নির্বাচিত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের সাধারণ মানুষের হিতার্থে কাজ করবেন বলে। ৩৪ বছরের একটি জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে সেই ক্ষমতা তাঁকে অর্পণ করেছিলেন সাধারণ মানুষ। এই অধিকার পাবার আগে যে বঞ্চনা, অবহেলা তাঁরা পাচ্ছিলেন, তাঁর অবসান তাঁরা চেয়েছিলেন বলেই পরিবর্তন এনেছিলেন। কিন্তু সেই আশা কতটা যে নিরাশায় পরিণত হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে সেটা তাঁরা কল্পনাতেও আনতে পারেননি। এমন একজনকে অভিভাবক হিসেবে তারা আনলেন, যিনি মিথ্যাটাকেই বাস্তবের মোড়কে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেন। সেটা বুঝতে একটু বেশি সময়ই লাগলো রাজ্যবাসীর। রাজ্যের প্রধান, মুখ্যমন্ত্রী আজ যে ক্ষেত্রেই লক্ষ্য দিয়েছেন, সেটারই ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার । এমনটাই বলছেন জনসাধারণ। এর পিছনে কারণ হিসেবে তারা বলছেন, তিনি পরিকল্পনা শব্দটার মানে বোঝেন না বা বোঝার চেষ্টাও করেন না। না হলে তাঁর কথার সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে বাস্তবের উলটো ছবিটা প্রকাশ্যে চলে আসে কেন? সব ক্ষেত্রেই তা দেখা গেছে। তাহলে কি তাঁর পার্ষদকুল এক কথায় পরিকল্পনা বিষয়টা জানেন না বা পরিকল্পনা মেনে তাঁর বাস্তব রূপ দিতে জানেন না? একথা বললে হয়তো পার্ষদকুলের আঁতে ঘা লাগতেই পারে। সে লাগুক, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এ কথা বলার অধিকার বা সমালোচনা করার অধিকার সংবিধান দিয়েছে সবাইকে। তবে আমাদের রাজ্যে এই সত্যটা মানতে পারেন না শাসককুল।

আমাদের রাজ্য এখন করোনার মহামারীর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হতে চলেছে। তবুও আমাদের আশার বাণী এই যে সীমিত সংখ্যক করোনা যোদ্ধা, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নকল বুঁদির গড়কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁদের কুর্নিশ জানাতে দ্বিধা নেই। মনে চাপা অসন্তোষ পুষে তারা পরিবার-পরিজন ছেড়ে অক্লান্ত ভাবে নিজেদের নিয়েজিত রেখেছেন এই যুদ্ধে। কিন্তু তাঁদের এই যুদ্ধের যিনি সেনাপতি, যার দায়িত্বে রয়েছে সবকিছু, যিনি দামামা বাজিয়ে বলে বেড়ান যে তাঁর রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সারা দেশের মধ্যে অন্যতম, তাঁর ভূমিকাটা কী? সেই প্রশ্ন কি কেউ তুলছেন? তোলার ক্ষমতা নেই।বা তুললেই কোতল মানে তিনি হয়তো একঘরে, অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বেন।

কথা হচ্ছিল বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে। তাঁরা নাম প্রকাশ করতে চান না। তাঁরা সবাই প্রথিতযশা চিকিৎসক। কেউই চান না আজকের শাসকদলের নোংরা রাজনীতির বলি হতে। তাঁদের বক্তব্য বা

মনোভাব একটু বলার দরকার আছে। তাঁদের মতে, রাজ্যের কোন হাসপাতালের কী পরিকাঠামো আছে, সেটা নিশ্চয় জানা আছে মুখ্যমন্ত্রীর বা তাঁর এই স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীদের। যখন করোনাকে নিয়ে একটা ঘোষণা হলো, তখন সেই তথ্যকে ভিত্তি করে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে কী এগোনা যেত না? প্রথম দিকে এই পরিস্থিতিকে সামলাবার মতো সময় হাতে ছিল। কিন্তু সেই সময়ে কী পরিস্থিতির মোকাবিলার ঘুঁটি সাজানো যেত না? অনেক চিকিৎসক আবার বলছেন, ‘‘যখন আমরা সামান্য হলেও ঢাল তলোয়ার পেলাম, তখন অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। আমরা সবাই ক্ষতবিক্ষত। লড়তে লড়তে হাঁপিয়ে উঠেছি। ওই প্রথমের সামান্য ভুলে এখন যখন বিষয়টার চেহারা সুনামির, তখন আর তাকে সামলাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এতো গেল করোনার কথা। কিন্তু সাধারণ চিকিৎসা! সেটার কী হচ্ছে? সে খবর কি রাখছেন কেউ? একের পর এক হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল করে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সেখানে সাধারণ চিকিৎসা করাতে আসা সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা লাটে উঠেছে। সেই বিষয়টার দিকে কি কেউ নজর দিয়েছেন কেউ? সম্প্রতি জোকা ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতাল হিসেবে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে। সেখানের ৫০০ শয্যার পুরোটাই করোনা চিকিৎসায় ব্যবহার করা হবে। এই হাসপাতালে সাধারণ শিল্প-কলকারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা চিকিৎসার সুযোগ পেতেন। কয়েকমাস আগে থেকেই বন্ধ সাধারণ পরিষেবা। বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ কোনোটাতেই সাধারণ রোগের চিকিৎসা হচ্ছে না। এই হাসপাতালের এক বিভাগীয় প্রধান জানিয়েছেন, সেইসব রোগী, যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত, ডায়ালিসিস নিচ্ছেন বা কোনো কঠিন রোগের নিয়মিত চিকিৎসার সুযোগ পেতেন, তাঁরা প্রায় বিনা চিকিৎসায় রয়েছেন। এদের সেই সামর্থ্য নেই যে পয়সা দিয়ে অন্য হাসপাতালে যাবেন। তাঁদের বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় বেঁচে থাকার অধিকারটাকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

গত কয়েকদিন আগের একটা ঘটনার কথা বলতে হচ্ছে একটি কারণে, ঠাকুরপুকুরের সত্যনারায়ণ পল্লীতে এক পরিবারের তিনজন আত্মহননের পথ বেছে নিলেন। অপরাধ তারা অর্থহীন, অসুস্থ অবস্থায় বেসরকারি কোনো জায়গায় চিকিৎসা করাবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে যদিও একটি গাড়িতে করে বেশ কিছু হাসপাতালে যাবার সুযোগ এসেছিল গুরুতর অসুস্থ অশীতিপর বৃদ্ধের। ওই সফরে সঙ্গী তাঁর সত্তরোর্ধ্ব স্ত্রী এবং তাঁর চলৎশক্তিহীন পুত্রের। এ-হাসপাতাল ও-হাসপাতাল ঘুরে বাড়ির সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল অ্যাম্বুলেন্স। কেননা সবাই ফিরিয়ে দিয়েছিল। বাড়িতে ফিরে গোটা পরিবার আর বাঁচতে চায়নি এই সমাজে। করোনার জেরে এখন কোনো হাসপাতালেই আর সাধারণ রোগের চিকিৎসা প্রায় হচ্ছে না বললেই চলে। এর পিছনে কারণ দুটো। এক চিকিৎসকরা সংক্রমণের ভয়ে চিকিৎসা করতে চাইছেন না। আর অন্য দিকে সংক্রমিত হবার ভয়ে সাধারণ রোগী চিকিৎসা করাতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। দ্বিতীয় কারণটা একেবারেই গৌণ। চিকিৎসকরা অধিকাংশ ভয়ে তাঁদের প্র্যাক্টিস বন্ধ রেখেছেন। নয়তো-বা যাঁরা হাসপাতালে রয়েছেন তাঁরা যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু করেই চলে আসছেন। বিশেষ করে করোনা চিকিৎসা করার ক্ষেত্রের বাইরের চিকিৎসকরা। আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে একটি ভয়ংকর চিত্র ফুটে উঠেছিল একটি সমীক্ষায়। সেই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে যে দুটি হাতিয়ারকে অবলম্বন করে এগোতে হয়, সেই চিকিৎসক ও প্যারা-মেডিক্যাল স্টাফ। সেই দুটি ক্ষেত্রেই সাধারণ যে অনুপাত থাকার দরকার সেটা নেই। প্রতি ১০০০ জনে এই অনুপাত ১.৮৩। যেটা একেবারে না হলে নয়, সেই অনুপাত হচ্ছে ২.২৫। ফলে বোঝাই যাচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সেই হাতিয়ারটুকুই আমাদের রাজ্যে নেই। অথচ ২০১৭ সালের একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার করা সমীক্ষা অনুযায়ী সারা রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে প্রায় বছরে ১২ কোটি মানুষ বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাবার জন্য নাম নথিভুক্ত করেন । তাহলে একটি প্রশ্ন এসেই যায়, এই সব মানুষদের সিংহভাগ এখন চিকিৎসা করাচ্ছেন কোথায়? চিকিৎসকদের মতে, এদের অধিকাংশই চিকিৎসা ক্ষেত্রের বাইরে রয়েছেন। এর একমাত্র কারণ, সরকারি হাসপাতালগুলোতে করোনা ছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোনো দিকে সেই অর্থে লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে না। একটি সামান্য উদাহরণ তারা দেন। বলেন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে কত মানুষ চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতেন। ওই হাসপাতালকে নিয়ে নেওয়ার ফলে বঞ্চিত হলেন তাঁরা। এটা কি সরকারি স্তরে পরিকল্পনার অভাব নয়? হঠাৎ করে নিয়ে নেওয়ায়, এই হাসপাতালে ভর্তি থাকা বহু রোগীর কথা চিন্তাভাবনায় আনা হলো না কেন?

কয়েকদিন আগের একটি ঘটনার উল্লেখ করতেই হচ্ছে। ঠাকুরপুকুরে একজন মহিলা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে সেই মুহূর্তে কোনো সরকারি হাসপতাল বা নার্সিং হোম ভর্তি নিতে অস্বীকার করে। পেসমেকার বসানো মহিলা একেবারে বিনা চিকিৎসায়, রাস্তাতেই প্রাণ হারান। এই অব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী কে? এই প্রশ্ন তোলার অধিকার কারোর নেই। আসলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাঁকা বুলি আজ মানুষ বুঝে ফেলেছে। আমাদের রাজ্যে সরকারি ক্ষেত্রে যোগ্য চিকিৎসক আছেন। তারা সরকারি স্তরে তাঁদের সেবা দেবার চেষ্টাও করেন। তা সত্ত্বেও পরিকল্পনার অভাবে সেই সেবা থেকে বঞ্চিত হন সাধারণ মানুষ, যারা একেবারেই চিকিৎসা করাবার জন্য নির্ভর করে থাকেন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর। আচ্ছা, সরকারি আমলা, মন্ত্রী ,ভাইপো বা মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং কি একেবারে শুরুতেই, তাঁর নিজের চিকিৎসার জন্য কোনো সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস করেন? নইলে ভাইপো-ভাইঝির চিকিৎসার জন্য মিন্টো পার্কের কাছের নামি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ নিতে হয় কেন? তাহলে কি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সেই পরিকাঠামো নেই? আবার যখন তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক কমিটি তৈরি করেন, সেখানেও সরকারি হাসপাতালের যোগ্য চিকিৎসকদের ঠাঁই দেন না কেন? তাহলে কি তিনি সরকারি চিকিৎসকদের যোগ্যতর মনে করেন না? এ প্রশ্নও তুলছেন অনেকেই। ফলে আজকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা লাটে তোলার মূল যে রাজ্যের অভিভাবক তা এক কথায় মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? আজকের স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্র বেসরকারি ক্ষেত্রের কাছে ক্রমেই বিকিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী কে? সেই অভিভাবক। একথাও বলা যেতেই পারে।

করোনার জন্য সংকুচিত রাজ্যের গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থা

ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়

আমি একজন ক্যান্সার শল্য চিকিৎসক। এই করোনা পরিস্থিতিতে আমার রোগীদের নিয়ে আমি খুব চিন্তিত। কারণ এখন প্রত্যেক মানুষের মনে এমন ভয় ঢুকে গেছে যে তারা আর কোনো হাসপাতালে চট করে আসতে চাইছেন না। এটাই আমাদের কাছে চিন্তার বিষয়। কেননা আমার রোগীরা এখন হয়ত যে স্টেজে রয়েছেন, করোনা যখন একটু নিয়ন্ত্রিত হবে, তখন যদি তারা আসেন, দেখা যাবে তাঁরা এমন একটা স্টেজে পৌঁছে গেছেন, সেখান থেকে ফেরানো আমাদের কাছে কঠিন।

করোনার কারণে রাজ্যের সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই অন্যরকম জায়গায়। এখন চিকিৎসা ক্ষেত্রের সমস্ত বিষয়টাই করোনাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রাজ্যে সিংহ ভাগ চিকিৎসককে সরিয়ে নিয়ে করোনার চিকিৎসার কাজে লাগানো হয়েছে। বহু হাসপাতালকে করোনার চিকিৎসাকেন্দ্র হিসাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা করাবার জায়গাটাই কমে গেছে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে, সাধারণ চিকিৎসা পাবার ক্ষেত্রে একটু হলেও বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের কথা বলতেই হয়, সরকারি বা বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রেই পরিষেবা দেবার ব্যাপারে স্বাভাবিক জায়গার থেকে অনেকটাই কম দিচ্ছে। ফলে রোগীরা যখন দেখছেন, হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারছেন না, তারা আর যাচ্ছেন না। যেমন একদিকে তাঁদের মনে সংক্রমণের ভয়টা গেড়ে বসেছে, অন্যদিকে সংক্রমিত হবার ভয়টাকেও জয় করতে পারছেন না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, করোনাতে যতজন মারা যাচ্ছেন, তাঁর থেকে অনেক বেশি মারা যান অন্য রোগে। এই অন্য রোগগুলি সেই রোগ যে রোগের নিয়মিত চিকিৎসা না করালেই মৃত্যু সামনে চলে আসবে। এটা নিয়ে সচেতন করাটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। তাই সাধারণ রোগীরা চিকিৎসা কেন্দ্রের দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন না। আমার যেটা মনে হয়েছে, সরকারি তরফে এই প্রচারটা করা হোক, যে আপনারা করোনা থেকে বাঁচতে গিয়ে ঘরের ভিতর বসে থেকে নিজের রোগটাকে চিকিৎসা না করান, তাহলে আপনি আপনার দীর্ঘদিনের রোগেই চরম দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। তবে এই প্রচার করার আগে অবশ্যই সরকারকে চিকিৎসা পাবার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। আমার মনে হয়, যে সব মারাত্মক রোগ, যেগুলির ক্ষেত্রে নিয়মিত চিকিৎসা পাওয়া দরকার, সেইসব রোগীকে চিহ্নিত করে, তাঁদের কাছে চিকিৎসা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। আর একটা বিষয়, এখন হাসপাতালগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে এগোতে হবে। কোভিড ও নন-কোভিড। কোভিড হাসপাতালে পুরোপুরি করোনার চিকিৎসা হোক। আর যেগুলি নন-কোভিড সেখানে অন্য সব রোগের চিকিৎসা করাবার সুযোগ পাক সাধারণ রোগীরা। মেডিক্যাল কলেজগুলির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কলকাতা মেডিক্যালকে যেমন পুরোপুরি কোভিড করা হয়েছে, তেমসন এন আর এস বা আরজিকরকে রাখা হোক নন-কোভিড হিসাবে।

করোনার চিকিৎসায় শুরু থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া উচিত ছিল

ডাঃ প্রাঞ্জল রায়

করোনার আবহে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসাক্ষেত্রে গভীর সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। আমাদের হাসপাতাল সাধারণ শ্রমিক, কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য নিবেদিত। আর এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে একটি মেডিক্যাল কলেজ। এই হাসপাতালের শুরু থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমেত কলকাতা ও সারা রাজ্যের অসুস্থদের সব ধরনের রোগের চিকিৎসা করে আসছে। ফলে বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে রোগীর চাপ খুব বেশি। ইএসআই হাসপাতাল মূলত সেইসব মানুষদের সেবা বা চিকিৎসা দেয়, যারা বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারবেন না। আমরা এখানে একেবারে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিনাব্যায়ে বিমাকৃত শ্রমিকদের দিই। এইসব মানুষদের মধ্যে এমন অনেক রোগী আছেন যারা নিয়মিত চিকিৎসার সুযোগ না পেলে জীবন হানির ঘটনাও ঘটতে পারে।

করোনা সংক্রমণ যখন শুরু হলো সেই সময় আমাদের কাছে করোনার চিকিৎসা করবার জন্য অনুরোধ ও নির্দেশ আসে এবং বলা হয় হাসপাতালটি করোনার চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হতে পারে। জেলা প্রশাসন আমাদের প্রস্তুত থাকতেও বলে। আমরা তখন থেকেই সাধারণ চিকিৎসার বিষয়টাকে হাসপাতালে ধীরে ধীরে কমিয়ে দিই। একসময়ে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। আর হাসপাতালে রোগী ভর্তিও বন্ধ করে দিতে হয়। ফলে আমাদের কাছে যারা নিয়মিত চিকিৎসার সুযোগ নিতেন বা সেই সব মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই থমকে গেছে। ফলস্বরূপ যা হলো তাতে একজন চিকিৎসক হিসাবে মানবিক যন্ত্রণার শিকার হলাম।

এই ধরনের মহামারী এলে, সরকারের আপতকালীন একটা ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকটি হাসপাতালকে নির্দিষ্ট করে প্রাথমিক ভাবে শুধুমাত্র করোনার চিকিৎসাকেন্দ্র হিসাবে রাখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায়, করোনা সুনামির ধাক্কাটা সহ্য করতে গিয়ে আর পারছে না কেউ। যার ফলে রাজ্য জুড়ে সাধারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সংকট গভীর হয়েছে। আর একটা বিষয়, হাসপাতালের চিকিৎসকদের মনে যেমন করোনা সংক্রমণের ভয় পরোক্ষে কাজ করছে তেমনি সাধারণ রোগীদের মনেও হাসপাতালের প্রতি একই কারণে ভয়। ফলে পরে যখন সব চালু হবে, তখন একটি করোনা হাসপাতালে রোগী কতটা আসবেন, সেটাও ভাববার বিষয়। আমার যেটা মনে হয়, করোনাকে নিয়ে এখনো ভাববার সময় আছে। রাজ্যের অধিকাংশ হাসপাতাল, চিকিৎসক, চিকিৎসা সহায়ক কর্মীদের করোনার কাজে না লাগিয়ে, সামান্তরালভাবে এলাকায় এলাকায় সাধারণ রোগীদের চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি হেলথ সার্ভিস এই মুহূর্তে প্রয়োজন আছে। নইলে করোনায় মৃত্যুহার যা রয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি মৃত্যু হবে করোনার বাইরে থাকা রোগীদের।

সেবাকাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরম্পরা

ভারতবাসী সবাইকে সুখী দেখতে চায়। সকলের শান্তি চায়। তাই সেবার মধ্য দিয়ে তা করবার চেষ্টা করে। আর এই সেবার পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এটাই সঙ্ঘের পরম্পরা। এই পরম্পরাকেই স্বয়ংসেবকরা বহন করে চলেছেন।

বিনয় বর্মন

ভারতীর জীবনের ধর্ম হলো সেবা। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে এই ধর্ম পালন করে আসছে। এই দেশ বহু ধ্বংসলীলা দেখেছে। দেশের বুকে বারেবারে নেমে এসেছে বন্যা, খরা, মহামারী। ভেঙে গেছে বুকের পাজর আর পিঠের মেরুদণ্ড। তবু এই দেশ প্রতিবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর এই উঠে দাঁড়ানোর মূলে রয়েছে সেবা। এখানে কেউ কারও দুঃখ সহ্য করে না। এখানে একজনের বিপদে আর একজন এসে পাশে দাঁড়ায়। বিপদের সময় সকলে একসঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পছন্দ করে। আত্মব্রহ্ম ভাব ভারতবাসীর সকলের মধ্যে বিরাজ করে। রবীন্দ্রনাথ আত্মব্রহ্ম বলেছেন— 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।' তিনি সবার মধ্যেই বিরাজমান। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সেই মানব হয়েই মানুষের সেবা করে চলেছে। রাষ্ট্রের সেবা করার জন্য যে সংগঠনের জন্ম, সেই কাজ করে চলেছে সঙ্ঘ। ভারতের বুকে যতবারই কোনো বিপর্যয় নেমে এসেছে ততবারই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মানুষের মুখে দু'মুঠো অন্ন, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের 'ভারতবাসী আমার ভাই' এই ধ্যেয় বাক্যকে কখনও ভুলে যায়নি।

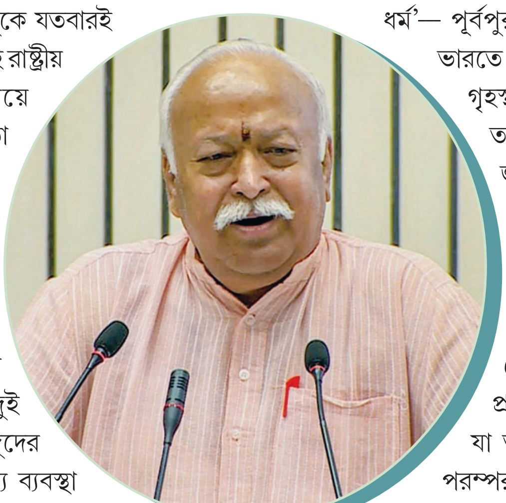

তাই ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় মুসলিম লিগের অত্যাচারে দুই পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের সেবা, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছে সঙ্ঘ। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে 'বাস্তুহারা সমবায় ও সমিতি'। পঞ্জাবে 'পঞ্জাব রিলিফ ফান্ড'। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করে দেশের সেবায় এগিয়ে আসে। স্বয়ংসেবকরা দেশের একতা ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের পরিত্রাতার ভূমিকা বারবার গ্রহণ করেছে সঙ্ঘ। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা পীড়িত মানুষের সেবা করবার জন্য সবার আগে ছুটে গেছে। নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে পীড়িত আর্তের সেবা করেছে। তা ১৯৬৬ সালে বিহারের প্রচণ্ড খরা এবং দুর্ভিক্ষ হোক বা ১৯১৯ সালে ওড়িশার সুপার সাইক্লোন হোক, গুজরাটের ভূমিকম্প (২০০১) হোক বা ২০০৪ সালের সুনামি হোক, ২০০৯ সালের আয়লা, উত্তরাখণ্ডের বন্যা (২০১৩,২০১৭), কেরলের বন্যা (২০১৮) বা উত্তরপ্রদেশ-বিহারের বন্যা (২০১৯) সর্বত্র সবার আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বর্তমানে করোনা মহামারী সময়েও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা সবার আগে।

এই সেবার মানসিকতা ভারতের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে। সেবা ভারতের পরম্পরা, ভারতের সংস্কৃতি। সঙ্ঘ সেই পরম্পরা, সেই সংস্কৃতিকে বহন করতে আগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলেছে। 'সেবা পরমো ধর্ম'— পূর্বপুরুষদের কাছে সকলে শুনেছে। প্রাচীন ভারতে মুনি ঋষিরা ভ্রমণ করতে করতে কোনো গৃহস্থ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালে, কেউ তাদের ফিরিয়ে দেয় না। নর রূপে নারায়ণ জ্ঞানে তাদের সেবা করে। ভারতবর্ষের মানুষ আর্তের সেবা করাকে পুণ্য মনে করে। মানব জীবনে ঈশ্বরের পূজার একটি অঙ্গ সেবা। সে কারণে কোনো প্রতিদানের আশা না করে দীন-দুঃখীর সেবা করে। এর জন্য কোনো প্রেরণার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় হৃদয়ের টান। যা ভারতীয়দের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরা অনুসারে চলে আসছে। তাই যে সেবা করে সে অভিনন্দনের আকাঙ্ক্ষা করে না। আমাদের গৃহস্থ বাড়ির দরজায় যদি কোনো পীড়িত ব্যক্তি এসে মাকে জানায়— 'মা আমার খিদে পেয়েছে।' সে খালি পেটে ফিরে যায় না। মা কোনো শাস্ত্র পড়েননি, লেখাপড়া জানেন না। তবুও সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে দুটো খেতে দেন। কারণ আমাদের মা ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে বড়ো হয়েছেন। এই সমাজ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ দিয়ে। রামায়ণের রামচন্দ্রের মতো পরমবীর সেবাকর্মে

নিজরাজ্যকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে তুলেছিলেন। রামায়ণের মধ্যেই পরিচয় পাওয়া যায় দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্রের। অষ্টাদশ পুরাণের সার হিসেবে বেদব্যাস বলেছেন— পুণ্য আর পাপ। পরের উপকার করাই পুণ্য আর পরপীড়নই পাপ।

'অষ্টাদশে পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।
পরপোকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।।'
গোস্বামী তুলসীদাসও বলেছেন—
'পবহিত সরিস ধর্ম নহি ভাই।
পরপীড়া সম নহি অর্ধমাই।।'

আসলে ভারতের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে সেবা। এই বোধই আমাদের সর্বদা সেবাকর্মে প্রেরণা দেয়। আর সেই প্রেরণার টানেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রথধম থেকেই সারা ভারতবর্ষে সেবা কর্ম আজও প্রবাহমান। সেবা-সংস্কৃতির এই পরম্পরার কথাই করোনা মহামারীর সময়ে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল তিনি তাঁর বক্তৃতায় জানান— 'মহামারীকে ভয় পেলে চলবে না। ঠাণ্ডা মাথায় আত্মবিশ্বাস নিয়ে যোজনা পরিকল্পনা করতে হবে। অসুখটা নতুন, যেটুকু জানা যাচ্ছে সেই মতো চলতে হবে। সেবার কাজ মাঝপথে ছাড়লে চলবে না; ক্লান্ত হলে চলবে না। সবাইকে আমরা সেবা করবো এবং অন্যকে সেবার কাজে উৎসাহিত করব। যে চাইবে ওষুধ ও পথ্য তাকেই দেব। এটাই আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের ঐতিহ্য। পীড়িত মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ করবো না। সেবার মধ্যে থাকবে শ্রদ্ধা, কারণ এটা উপকার নয়।'

এই মানসিকতা নিয়েই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা করোনা মহামারীর

করে চলেছে। কোনো বাধাবিপত্তিতে পিছপা হয়নি। আত্মীয়তার ভাব নিয়ে কাজ করে চলেছে নিরলস ভাবে। ভারতমাতার পিছিয়ে পড়া সন্তানদের ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছে বারবার। কোনো অভিনন্দন প্রাপ্তির জন্য নয়। আর্তের সেবা করাকেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা পরম কর্তব্য বলে মনে করে। এর জন্য কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়নি। পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজীর কথায়— 'সেবার মানসিকতা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়ে থাকি। তাদের ব্যবহার, আচার-আচরণ, মানসিকতা আমাদের ভিতরে সেবার প্রেরণা কখন তৈরি করে দেয় আমরা বুঝতেই পারি না। আর এর প্রথম সূচনা হয় বাড়ির মধ্যে। বাড়িতে কোনো ভিখারি ভিক্ষা করতে এলে মা ভিখারিকে নিজে দান না করে নিজের শিশু সন্তানকে দিয়ে দান করান। যেন তার সন্তানের মধ্যেও সেবার মানসিকতা তৈরি হয়।' ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই পরম্পরা মধ্যেই দেশজুড়ে সেবাকাজে নেমেছে। সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত — সেবা ভারতী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, আরোগ্য ভারতী, জাতীয় সেবিকা সমিতি, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈখিক মহাসঙ্ঘ প্রভৃতি সংগঠন দিনরাত সেবাকাজ করে চলেছে। বিদেশের স্বয়ংসেবকরাও সেখানে এই সেবাযজ্ঞে শামিল হয়েছেন।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীতে ২ মে পর্যত সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষের ৮৫৭০১টি স্থানে সেবা কাজ করা হয়েছে। এতে অংশ গ্রহণ করেছে ৪৭৯৯৪৯ জন স্বয়ংসেবক। মোট এক কোটি ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৫০টি পরিবারে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। রান্না করা খাদ্যের ৭ কোটি ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫০০টি প্যাকেট প্রদান করা হয়েছে। ২৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯১ জন পরিযায়ী শ্রমিককে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হয়েছে।

৩৯,৮৫১ ইউনিট রক্তদান করা হয়েছে। ৬২ লক্ষ ৮১ হাজার ১১৭টি মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। ১,৩১৪৪৩ জন গৃহহীনের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরের রাজ্যের ভ্রমণ, শিক্ষা, তীর্থদর্শন করতে গিয়ে আটকে পড়া ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৩০ জনকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের সেবা কাজ চলছে সমানভাবে। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ দুটি প্রান্তে বিভাজিত। দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ। আন্দামান নিকোবর নিয়ে যে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত তাতে ১৫,৭৪০ জন স্বয়ংসেবক কঠোর পরিশ্রম করে সঙ্ঘের সেবাকাজ সর্বত্র পৌঁছানোর চেষ্টা করে চলেছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৫৭৫০ স্থানে সেবাকাজ করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৬৫টি পরিবারে রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সেবা, শিশুখাদ্য, পাচন, হোমিওপ্যাথি ওষুধ ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান করা হচ্ছে। মোট ৮০ জন ডাক্তার এখনও ফ্রি হেল্পলাইনের মাধ্যমে তাদের সেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। ৫০ হাজার লোকের কাউন্সিলিং করা হয়েছে। দু'লক্ষ মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। ৪০০ ইউনিট রক্তদান করা হয়েছে। তাছাড়া সঙ্ঘের যে বিবিধ সংগঠন তারা মোট ৪ হাজার স্থানে ১২ হাজার কার্যকর্তা মোট ৩ লক্ষ পরিবারের সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন।

সিকিম সহ উত্তরবঙ্গের স্বয়ংসেবকরাও সমাজের সর্বত্র সেবাকাজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছেন। এখনো পর্যন্ত ৬৫৬০ জন স্বয়ংসেবক ২ হাজার ৮১১ স্থানে সঙ্ঘের সেবাসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন। এর ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ৮৬ হাজার ৯৮৮টি পরিবার। ৬১ হাজার ১৬৬টি শুকনো রেশন কিট এবং ২০ হাজার ৬০৮টি খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। ৩৮ হাজার ৫৯০টি মাস্ক, ১৪ হাজার ৫০৯টি সাবান ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। এই কঠিন মহামারীর মধ্যেও ৬০টি রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকা স্যানিটাইজ করা, শিশুদের জন্য শিশুখাদ্য প্রদান, সাফাই কাজ, সাফাইকর্মীদের সংবর্ধনা দান ও অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে করে চলেছে

ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে সেবা কাজ করে চলেছেন সেখানকার স্বয়ংসেবকরা। টাইমস অব ইন্ডিয়া'র খবর অনুযায়ী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম বড়ো সেবাকাজ পরিচালনা করেছে। এই সেবাকর্মে আমেরিকার ২২৫০০ স্বয়ংসেবক অংশ গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ংসেবক পরিচালিত সেবা ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকা-সহ সারা বিশ্বে ৮ লক্ষ ৯০ হাজার আমেরিকান ডলার সংগ্রহ করে সেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ১৫০ ইন্টারন্যাশনাল ছাত্রকে তাদের থাকা খাওয়া এবং দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ৪৬ হাজারেরও বেশি এন-৯৫ মাস্ক ও ৫০০ লিটারের বেশি স্যানিটাইজার বিলি করেছে। সারা বিশ্বে সেবা ইন্টারন্যাশনাল ও হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যেখানেই প্রয়োজন পড়েছে, বিশ্ববাসীর সেবায় নিজেকে উজার করে দিয়ে চলেছে।

ভারতবাসী সবাইকে সুখী দেখতে চায়। সকলের শান্তি চায়। তাই সেবার মধ্য দিয়ে তা করবার চেষ্টা করে। আর এই সেবার পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এটাই সঙ্ঘের পরম্পরা। এই পরম্পরাকেই স্বয়ংসেবকরা বহন করে চলেছেন। ■

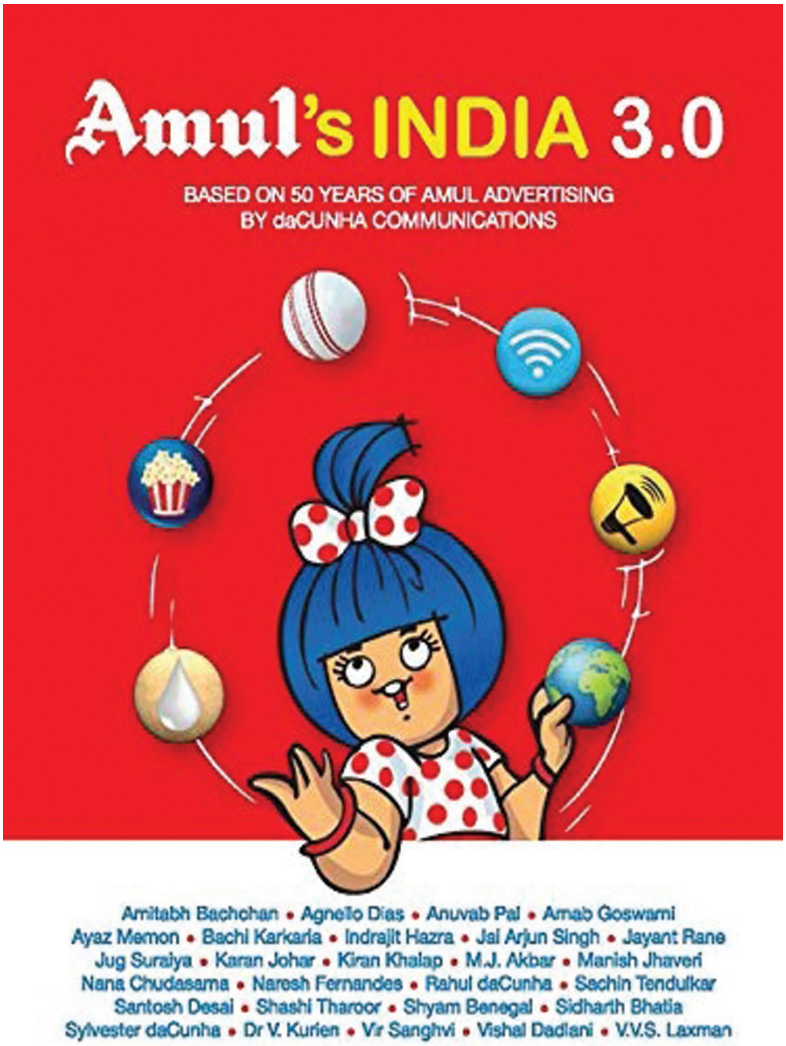

ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতের আত্মাকে পদদলিত করেছিলেন

অজয় সরকার

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে গিয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, "At the stroke of the midnight hour, when the World sleeps, India will awake to LIFE and FREEDOM." বাধভাঙা আনন্দে উচ্ছ্বসিত ভারতবাসী... এ উচ্ছ্বাস বিদেশি ইংরেজ শাসকের গোলামির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির উচ্ছ্বাস। ভারতের ভাগ্যদেবতা হয়তো সেদিন সবার অলক্ষ্যে মুচকি হেসেছিলেন। **১৯৭৫ সালের ২৫ জুন** অর্থাৎ ২৭ বছর ১০ মাস এগারো দিনের মধ্যরাতে এক নারীকণ্ঠ হিংস্র শ্বাপদের চাপা কণ্ঠস্বরে আকাশবাণীর মাধ্যমে দেশবাসীকে জানিয়ে দিল, "রাষ্ট্রপতি মহোদয় নে আপৎকাল ঘোষণা কিয়া"। এর চেয়ে বড়ো পরিহাস দেশবাসীর ভাগ্যে আর কী হতে পারে! জওহরলাল দেশবাসীকে লাইফ অ্যান্ড ফ্রিডম দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন, আর তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৩৫২ ধারার মধ্য দিয়ে জনগণের লাইফ ও ফ্রিডম একলহমায় কেড়ে নিলেন। দেশে জরুরি অবস্থা ২১ মাস ব্যাপী জারি ছিল।

কী ঘটেছিল এই জরুরি অবস্থার সময়ে?

এককথায়, জীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সংসদকে এড়িয়ে শ্রীমতী গান্ধী স্রেফ 'Decree' জারি করে দেশ চালাতে লাগলেন। তামিলনাডু ও গুজরাটের সরকার অসাংবিধানিক ভাবে ভেঙে দেওয়া হলো। জাতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোকে নির্লজ্জভাবে সরকারি মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যবহার করা হলো। সংবাদমাধ্যমকে টুঁটি চেপে স্তব্ধ করা হলো। এমনকী, জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মদিনের শুভেচ্ছা না ছাপতে একটি জাতীয় স্তরের পত্রিকাকে বাধ্য করা হলো।

ইন্দিরা-পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে নির্বিচারে গরিব গুর্বোদের ধরে নিয়ে নির্বীজকরণ চললো। ভাবটা এমন যেন গরিবরা দেশের শত্রু, আবার অন্যদিকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য স্লোগান দেওয়া শুরু হলো 'গরিবি হটাও'। ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংবিধানের

গৌরবকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হলো। জনসাধারণ সঙ্গত ভাবেই কন্সটিটিউশন অব ইন্ডিয়াকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো কন্সটিটিউশন অব ইন্দিরা। সবচেয়ে বড়ো কথা, দেশের মানুষকে সংবিধান যে মৌলিক অধিকার দিয়েছিল, তা কেড়ে নেওয়া হলো। Maintenance of Internal Security Act (MISA) চালু করা হলো। আমি দেখেছি, জমির আল নিয়ে বিরোধে কংগ্রেস নেতার বিরাগভাজন হওয়ায় তার উপর মিসা প্রয়োগ করা হয়েছে। গোটা দেশ, সমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমেত অনেক সামাজিক সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। অথচ, The RSS was noted as being "the only non-left revolutinary force in the World by "THE ECONOMIST" due to their organisation of peaceful "SATYAGRAHA" movements. আরএসএস-এর কার্যকর্তা থেকে সাধারণ স্বয়ংসেবকদের নির্বিচারে আটক করা হলো। নিপীড়ন ও অত্যাচারের সীমা সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেল। যদিও কাগজে কলমে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হলো, বাস্তবে তার প্রয়োগ হলো ২৩ মার্চ, ১৯৭৭ সাল।

ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করলেন কেন?

এ নিয়ে রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরি অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা থাকলেও মূল বক্তব্য একই থেকে গেছে। সেগুলো এরকম :

এক, গুজরাটের 'নবনির্মাণ আন্দোলন' স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি বাড়ানোর বিরুদ্ধে শুরু হয়। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেল এবং তার সরকার। এই সরকার এতো দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল যে গুজরাটের লোকজন তাদের মুখ্যমন্ত্রীকে 'চিমনচোর' বলতো। রাজ্য যেন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও মানবিকতা বিবর্জিত শাসন ব্যবস্থার এক জীবন্ত নাট্যশালা। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র তার 'India Since Independence' গ্রন্থে লিখেছেন, "The last act of the Gujrat drama was played in March 1975 when, faced with continuing agitation and fast unto death by Morarji... Indira।

দুই, গুজরাটের পথেই শুরু হলো বিহারে আন্দোলন। ৭১ বছর বয়সি জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ। এটাও প্রথমে ছিল ছাত্র আন্দোলন এবং পরে তার ব্যাপ্তি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা এতো বেশি ছিল যে সরকার নিষ্ঠুর দমন পীড়নের আশ্রয় নেয়। ফলে, জয়প্রকাশ নারায়ণ দেশের পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে দেশের সংবিধান অনুসারে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করার আহ্বান জানান। স্বৈরাচারিণীর মনে আতঙ্ক, কারণ তিনি ধরে নিলেন যে জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর বিরুদ্ধে দেশের পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে উস্কিয়ে দিয়েছেন।

তিন, বিহার যখন জ্বলছে, সেই সময় সোশালিস্ট নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালে শুরু হলো রেল ধর্মঘট। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা এতো বেশি ছিল যে সরকারকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে অনেক স্থানে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছিল।

চার, পরিশেষে এলো ইন্দিরার বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে রাজনারায়ণের দাখিল করা মামলার রায়। রায়বেরিলি লোকসভা কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী রাজনারায়ণের বিরুদ্ধে প্রার্থী রূপে

বিজয়ী হয়েছিলেন। রাজনারায়ণের অভিযোগ ছিল যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে আইনস্বীকৃত অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ বেআইনিভাবে খরচ করেছেন এবং সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করেছেন। ১২ জুন ১৯৭৫, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহন সিনহা শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনকে 'Null and Void' বলে রায় দিলেন। অবশ্য, কোর্ট ইন্দিরা গান্ধীকে ২০ দিনের সময় মঞ্জুর করলেন যাতে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারেন। ২৪ জুন, ১৯৭৫, সুপ্রিম কোর্ট তাকে পুরোপুরি স্বস্তি দিতে পারলো না। অস্বস্তি বাড়লো দলের অন্দরমহলে। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতারা দলের স্বার্থে তাঁকে পদত্যাগের পরমার্শ দিলেন। শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতার লিপ্সায় বেপরোয়া হয়ে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করলেন।

এই গুলিই নিঃসন্দেহে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার অন্যতম কারণ ছিল। তবে মুখ্য কারণ হলো, নেহরু পরিবারের ক্ষমতায় থাকার দুর্নিবার বাসনা এবং যে কোনো ভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার অনৈতিক প্রয়াস। এটা আমরা জানি যে দেশের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের বাসনায় কীভাবে নেহরু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের পরিবেশ ধ্বংস করেছিলেন এবং গান্ধীজীকে বাধ্য করেছিলেন যাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। নেহরুর আকস্মিক প্রয়াণের পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর মৃত্যু আজও রহস্যে ঘেরা। যাইহোক, ১৯৬৬ সালে শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পর নেহরু তনয়ার রাজ্যাভিষেকের মধ্য দিয়ে নেহরু বংশের শাসনকাল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

যে কোনো Typical স্বৈরশাসকের মতো ইন্দিরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভকে জীবনের একমাত্র পরমার্থ বলে মনে করতেন। এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জন করতে হলে রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ, অর্থাৎ সংসদ, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অর্জন আবশ্যক। সংসদ ও প্রশাসনের ওপর ইন্দিরার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকলেও বিচার ব্যবস্থার উপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল না। বরং কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে দেশের সংবিধানের অ্যামেন্ডমেন্ট (সংশোধন) করা গেলেও সংবিধানের ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপ্যালকে পরিবর্তন করার অধিকার দেশের সংসদের নেই। এই রায় ছিল এক স্বৈরাচারিণীর চূড়ান্ত ক্ষমতা লাভের অশুভ প্রচেষ্টার প্রতি বড়ো বাধা। তাই বিচার বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী গান্ধী তিনজন সিনিয়ার বিচারপতিকে টপকে এএন রায়-কে প্রধান বিচারপতি হিসাবে বেছে নেন। কারণ কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা সরকারের মামলায় যে ১৩ জন বিচারপতিকে নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ গঠিত হয়েছিল সেই বেঞ্চের যে ৬ জন বিচারপতি এই রায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। বিচারপতি এএন রায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

আমরা অতীতের বেদনার্ত স্মৃতিচারণা করি যাতে আমরা ভবিষ্যতে ভুল না করি। প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যতে ভুলের সম্ভাবনা আছে কি?

বৈদিক যুগে শাসনতন্ত্র মূলত দুভাগে বিভক্ত ছিল— রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। তবে উভয় প্রকার শাসনব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্রই ছিল উত্তম। কিন্তু তাই বলে রাজতন্ত্র কখনোই রাজাকে স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ দেয়নি। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে লিখেছেন :

''প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞ প্রজানাং চ হিতে হিতম্।

নাত্মংপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্।।''

অর্থাৎ প্রজার সুখে রাজার সুখ, প্রজার হিতে রাজার হিত। প্রজার পক্ষে হিতকর এবং প্রিয়কর কার্যকেই রাজা হিত মনে করবেন। এটাই প্রাচীন ভারতের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শাসন ব্যবস্থায় অধিকাংশের মতানুসারে রাজাকে চলতে হতো। একটি ছোটো উদাহরণ ঃ সম্রাট অশোকের আদেশ সত্ত্বেও মন্ত্রী রাধাগুপ্ত বৌদ্ধসঙ্ঘের অনুদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ভাবুন, অশোক রাজা ছিলেন, তিনি ইন্দিরার মতো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ছিলেন না। অথচ রাজাকে মেনে নিতে হয়েছিল মন্ত্রী রাধাগুপ্তের নিষেধ। কারণ মন্ত্রীর নিষেধে প্রতিফলিত হয়েছিল প্রজাদের ইচ্ছা।

তাহলে ভারতের এই উন্নত শাসনতান্ত্রিক পরম্পরা থাকা সত্ত্বেও ইন্দিরা কেন জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করলেন? ভাবা হয়েছিল যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি স্বৈরাচারী শাসকের উত্থান হতে দেবে না। হলো কই? হিটলার, মুসোলিনি বা ইন্দিরাকে কী ঠেকানো গেল?

না, গেল না। কারণ ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাবতী যদি শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তাহলে তিনি অবশ্যই স্বৈরাচারী হবেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক হ্যাভেল বলেছেন যে, ইউরোপীয়দের মতো ''ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকারের জন্য অতীত ভারতে জনসাধারণকে কোনো সংগ্রাম করতে হয়নি।'' হ্যাঁ, এ দেশে Monarchy ছিল এবং তা ছিল Constitutional Monarchy। এসব ইউরোপীয়দের কাছে অকল্পনীয় ছিল। আমাদের দেশ যারা চালান তাদের বড়ো অংশই তো ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। হাজার বছরের বৈদেশিক শাসনে আমরা আজ আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে আত্মবিস্মৃত। আমাদের শেখানো হয়েছে ইউরোপীয় জীবনধারা উন্নত। অন্যদিকে, ভারতীয়রা অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক যাযাবর গোষ্ঠী। আমরা সেটা পড়ি, সন্তানদের পড়াই, নিজেরা পবিত্র মনে অনুসরণ করি। ফলে আমরা দেশের শাসন ব্যবস্থা থেকে 'ধর্ম'কে বিচ্ছিন্ন করে শাসনব্যবস্থাকে উন্নত করার এক ব্যর্থ অপপ্রয়াস করি। এই অমোঘ সত্য ভুলে যাই যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া ধর্ম দ্বারা পরিচালিত। একে বাদ দেওয়ার চিন্তা বাতুলতা মাত্র। দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সেকুলার শব্দকে ঢুকানো হয়েছে। অথচ আমাদের সংবিধান প্রণেতারা, বিশেষ করে বি আর আম্বেদকার এই সেকুলার শব্দের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, ভারতীয়দের জীবনপদ্ধতির অনুপম বৈশিষ্ট্যই হলো সর্বধর্ম সমভাব। নতুন করে এইসব কথা কেন? এইসব সেকুলার জাতীয় শব্দ ভারতের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা মতলববাজি ছাড়া কিছু নয়। আমরা ইচ্ছা করেই বুঝি না বা বুঝতে চাই না যে ধর্ম হলো সেই সব নিয়ম যা ধারণ করে মানুষ এবং সমাজ পার্থিব ও পারলৌকিক জগতে সুখ শান্তির পরম নিশ্চিন্ততা খুঁজে পায়। ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রেক্ষিতে ধর্ম কখনোই ইউরোপীয় রিলিজিয়নের প্রতিশব্দ নয়। ইউরোপীয় চিন্তায় রিলিজিয়ন একটি উপাসনা পদ্ধতির নাম। অন্যদিকে, ভারতীয় ভাবনায় ধর্ম হলো সমাজজীবন পদ্ধতি পরিচালনার সুসংবদ্ধ নিয়মাবলী। সমাজের গর্ভেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। তাই দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আমাদের আজ আত্মমন্থনের দিন। আমরা চাইবো, আর যেন 'THE DARKEST PHASE IN THE HISTORY OF INDIA' কখনো ফিরে না আসে। অতীত ভারতের গৌরবময় রাষ্ট্রীয় জীবনকে গভীরভাবে অনুধাবন এবং তা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমরা জরুরি অবস্থার পুনরাবৃত্তি রুখতে পারি। ■

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার নতুন কৌশল

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের ইসলামি জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলাম আইএস (ইসলামি স্টেট) কিংবা আল কায়েদার মতো দেশের প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলে নিজস্ব স্বাধীন এলাকা গড়ে তুলতে চায়। ঠিক সিরিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মতো। এই লক্ষ্যেই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনটি কাজ করছে। আনসার আল ইসলামের আট জঙ্গি র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের হাতে ধরা পড়ার পর জিজ্ঞাসাবাদে এমন তথ্য সামনে বেরিয়ে এসেছে। আরও জানা গেছে, জঙ্গি সংগঠনটি আগের মতো চাকু দিয়ে টার্গেট কিলিং করার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে। টার্গেট কিলিং সহজ করতে তারা পিস্তল ও রিভলবার এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে। সে মোতাবেক তারা অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করছে। পাশাপাশি নিজেদের প্রস্তুতও করছে। আটক জঙ্গিদের মধ্যে সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্যও রয়েছে।

র‍্যাব কর্মকর্তা মহিউদ্দিন ফারুকি জানান, জঙ্গি সংগঠনটি পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও সিরিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের নানা জঙ্গি সংগঠনের মতো দেশের প্রত্যন্ত একটি এলাকা দখলে নিতে চায়। এজন্য তাদের পছন্দ প্রত্যন্ত অঞ্চলের বা কোনো গভীর পাহাড়ের কোনো গ্রাম। সেই গ্রামের দখল নিয়ে তারা সেখানে ইসলামিক ভিলেজ গড়ে তুলবে। সেখানে মানুষের তৈরি আইন বা নীতি নয়, আল্লাহর আইনে সবকিছু চলবে। এনমনকী কেউ সরকারকে কোনো খাজনা দেবে না। ইসলামি আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। যেটিকে মুসলিম ভিলেজ নাম দেওয়া হবে। সেটাই হবে মূল জঙ্গি ঘাঁটি। সেখানে শক্ত অবস্থান নিয়ে তারা দেশে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদ করে যাবে। ফারুকি আরও বলেন,

বাংলাদেশের আয়নায়

জঙ্গি সংগঠনটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বিশেষ করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা অন্যান্য যেসব দেশে জঙ্গি সংগঠরে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে আধিপত্য আছে, তাদের মতো বাংলাদেশেও তাদের একটি গ্রাম টার্গেট ছিল। তারা দেশের যে কোনো একটি জায়গাকে মুসলিম ভিলেজ হিসেবে গড়ে তুলবে। ওই গ্রাম থেকে তারা তাদের কর্মকাণ্ড চালাবে। মুসলিম ভিলেজ গড়ে তুলতে তারা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কোমলমতি যুবকদের টার্গেট করে উদ্বুদ্ধ করে আসছিল। র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, মুসলিম ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা থাকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে তারা অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুত গড়ে তুলছিল। এজন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক সংগ্রহ করছিল। তাদের কাছে আইইডি (ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বোমা তৈরির বিপুল সরঞ্জাম, জঙ্গিবাদী বই, পিডিএফ ডকুমেন্টস মিলেছে। আটক জঙ্গিরা আরও জানিয়েছে, চলতি বছরের শুরু থেকে তারা এমন

তৎপরতা চালাচ্ছিল। করোনা ভাইরাসের কারণে বাহ্যিক কাজে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। সম্প্রতি আবার তারা তৎপরতা শুরু করেছে।

অমুসলমানদের ইসলাম গ্রহণে প্ররোচনা, অর্থ সহায়তা :

একটি বিজ্ঞাপন ''পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে অনলাইনে বিশেষ আয়োজন ২০ দিন ব্যাপী অমুসলমানদের মাঝে দাওয়াহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স, সময় সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। তারিখ ২৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মে পর্যন্ত। রমযান : ১ রমযান থেকে ২০ রমযান পর্যন্ত। অমুসলমানগণ আল্লাহ তা আলর বান্দা। প্রিয় নবীজীর উম্মত। তারা প্রতি মুহূর্তে চিরস্থায়ী জাহান্নামে ঝাঁপ দিচ্ছে। খ্রিস্টান মিশনারিরা মুসলমানদের দাওয়াতে দিয়ে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কে বাঁচাবে তাদেরকে, কোনো নবী-রসুল আর আসবে কী? আসবে না। তাই নবীওয়ালা যিম্মাদারী নিয়ে আমাদেরই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তাদেরকে বাঁচাতে। দ্বীন ও মুসলমান উম্মাহর এই অনিবার্য প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে আমাদের এই আয়োজন। প্রশিক্ষণের বিষয় : হিন্দু ভাইদের দাওয়াতে দেওয়ার পদ্ধতি। খ্রিস্টান ভাইদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি। মুতাদ ভাইদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি। অমুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর। তথ্যসূত্র : কুরআন, হাদীস, বাইবেল, কিতাবুল মোকাদ্দাস, বেদ, পুরাণ, উপনিষদ। ক্লাশ : সরাসরি ফেইসবুক আইডি থেকে লাইভ দেওয়া হবে। কোর্স সংক্রান্ত তথ্য জানতে যোগাযোগ : এন০১৭২৬-০৫১৮০১। আলোচক : মুফতি যুবায়ের আহমেদ সাহেব, পরিচালক, ইসলামি দাওয়াহ ইন্সটিটিউট, বিশিষ্ট দায়ী, লেখক ও গবেষক। বিষয় : দাওয়াতের কর্ম পদ্ধতি ও দায়ীর গুণাবলী। ইসলামি দাওয়াহ ইন্সটিটিউট, মান্ডা, মুগদা, ঢাকা ১২১৪।'' ইসলামি দাওয়াহ ইন্সটিটিউটের পরিচালক যুবায়ের দারুল উলুম, দেওবন্দ-এ মাস্টার্স পর্যন্ত পড়েছেন। এভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছে নিউ মুসলিম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠানও, যার ঠিকানা হাউজ নম্বর ২৯/এ, রোজ নম্বর ০৮, মোহাম্মদি হাউজিং সোসাইট, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এর প্রতিষ্ঠা সভাপতি মওলানা খান মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক। এই প্রতিষ্ঠান ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের (নও মুসলিম) জন্য যাকাতের নামে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছে বলে জানিয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক স্মারকলিপিতে বলেছে, ইসলামি দাওয়াহ ইন্সটিটিউট এবং নিউ মুসলিম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তৎপরতা একই সূত্রে গাঁথা। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অমুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে মিথ্যা ও বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া এবং ধর্ম ত্যাগের উস্কানি দিয়ে ইসলাম গ্রহণে প্ররোচিত করা। আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, ধর্মত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এ ধরনের তৎপরতা সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার নতুন কৌশল :

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে নতুন কৌশল যুক্ত হয়েছে। কয়েক বছর ধরে ফেসবুকে হিন্দু সমাজের কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে তার নামে ইসলামবিরোধী কোনো বক্তব্য পোস্ট করা হয় এবং ওই এলাকার মুসলমানরা এটাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাণ্ডব চালায়, বাড়িঘর, মন্দির ভাঙচুর, লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। মূল লক্ষ্য হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দেশত্যাগে বাধ্য করা। হিন্দুদের ওই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে তদন্ত করে পুলিশ জানতে পারে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি নিরপরাধ। কিন্তু মামলা চলতে থাকে। তিনি থাকেন কারাগারে। পাবনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজারের রামু, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, ভোলা-সহ বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের অন্তত ২০টি ঘটনার

কথা জানা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে করোনার ভয়াবহতার মধ্যে এই কৌশল আরও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। ইসমাইল আবির নামে এক ব্যক্তি কয়েকদিন আগে ফেসবুক প্রোফাইলে পোস্ট দিয়েছে“ আমরা সত্যের পথের সৈনিক। আর্যদের টার্গেট করা হয়েছে। আমরা আর্যদের নামে ফেইক আইডি খুলে নবী মোহাম্মদ (সা.)কে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জঙ্গি বলবো, নবীকে মূর্খ বলবো, নবী মোহাম্মদ (সা.)কে ধর্ষক বলবো, আবার মোহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহর ফেইক আইডি বলবো, তারপর সেই লেখার স্কিনশট করে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে দেব। এইভাবেই বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হবে মাশাআল্লাহ।” এর সঙ্গে ইসমাইল আবির ও তার অনুসারীদের কুরুচিপূর্ণ ও ধর্মীয় উস্কানিমূলক মন্তব্য এবং হিন্দুদের ওপর হামলা ও হত্যার হুমকিও রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে একটি অ্যাপসও তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপসে তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের বিপদগ্রস্ত করে তাদের মধ্যে দেশত্যাগের প্রবণতা তৈরির কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এইসব পরিকল্পনার কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ঐক্য পরিষদ আরও জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কথিত ইসলামবিরোধী পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে গত ২৪ এপ্রিল মানিকগঞ্জে রনি সত্যার্থী ও ৫ মে ঢাকার নবাবগঞ্জে রাকেশ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অথচ যে দুই আইডি থেকে তাদের নামে পোস্ট হয়েছে, দুটোই ভুয়া। তাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত নন।

সেই রামশীলে আবার হিন্দু হত্যা :

হিন্দু প্রধান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলার রামশীল গ্রামের মানুষ একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছে, ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিএনপির হামলা, নির্যাতন ও ধর্ষণ দেখেছে। রামশীল তখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে স্থান করে নিয়েছিল। সেই রামশীল আবার পত্র পত্রিকার শিরোনামে এসেছে। এবার বর্তমান আমলে রামশীলে নিখিল তালুকদার নামে একজন হিন্দু পুলিশের নির্যাতনে মারা গেছেন। তিনি পেশায় একজন কৃষক। গত ২ জুন রামশীল বাজারের কাছে সেতুর পাশে নিখিল আর তিনজন তাস খেলছিলেন। খবর পেয়ে কোটালিপাড়া থানার এএসআই শামীন উদ্দিন দুই পুলিশ-সহ সেখানে যান এবং মোবাইলে তাদের ছবি তোলেন। ঘটনা টের পেয়ে চারজন সেখান থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। অন্য তিনজন পালিয়ে যেতে পারলেও নিখিলকে ধরে ফেলেন এএসআই। এরপর তাঁর ওপর নির্মম নির্যাতন করা হয় এবং এতে তার মেরুদণ্ডের তিনটি হাড় ভেঙে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় নিখিলকে প্রথমে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও পরে ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরদিন বিকেলে তিনি মারা যান। নিখিল তালুকদারের স্ত্রী ইতি তালুকদার অভিযোগ করে বলেছেন,‘ আমার স্বামীকে এএসআই শামীম ধরে মারধর করেছেন। এক পর্যায়ে হাঁটু দিয়ে পিঠে আঘাত করা হয়। এতে আমার স্বামীর মেরুদণ্ডের তিনটি হাড় ভেঙে যায়।’ এএসআই শামীমকে বাঁচাতে কোটালিপাড়া থানার ওসি শেখ লুৎফর রহমান অদ্ভুত এক তত্ত্ব হাজির করেন। তার দাবি নিখিলকে পুলিশ মারধর করেনি। তিনি দৌড়ে পালানোর সময় গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে কোমরে ব্যথা পেয়েছেন। পরে হিন্দুদের ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে এএসআই শামীমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে তাকে কোটালিপাড়া থানা থেকে প্রত্যাহার করে গোপালগঞ্জ জেলা পুলিশ দপ্তরে ক্লোজড করা হয়েছিল। শামীমের সহযোগী রেজাউল ইসলামও গ্রেপ্তার হয়েছেন। নিখিলবাবুর মৃত্যুর ঘটনায় ২৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, রামশীলের এই ঘটনা আমেরিকায় সম্প্রতি শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের নিহত হওয়ার ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। মনে হচ্ছে, আমেরিকার মতো বাংলাদেশের পুলিশেরও এখন আর লাঠি-অস্ত্রের দরকার নেই। হাঁটুই যথেষ্ট।

চাঁদপুরে শ্মশান দখল :

চাঁদপুর সদর উপজেলার মৈশাদি ইউনিয়নের হামানকর্দি গ্রামে হিন্দুদের একটি শ্মশানের ১৮ শতাংশ জায়গা জোর করে দখল করে নিয়েছে প্রতিবেশী উকিল বাবরুল আমিন। লিটন বণিক, অমর শীল, শীতল শীল ও মল্লিকা বণিক জানিয়েছেন, অ্যাডভোকেট আমিন কয়েকজন লোক নিয়ে গত ৬ মে শ্মশানে ঢুকে ৪টি স্মৃতিমন্দির ভেঙে ফেলে, তারপর কাঁটাতার বসিয়ে দখল করে। এই অমানবিক ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

অতিথি কলম

হর্ষ পন্থ

চীনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতকে গণতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষ নিতে হবে

অতীতে চীনের সঙ্গে ভারতের মূলগত পার্থক্য বোঝাতে ভারত বার বার তার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কথা ব্যক্ত করেছে, আজ যা একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বহু দেশ এই বিন্দুটির ওপর প্রাপ্য গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি অতি দ্রুত পালটে 'new normal'-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেশব্যাপী নতুন সমীকরণ তৈরি করছে। এই অবস্থার পরিবর্তন কয়েক মাস আগেও হয়তো অচিন্তনীয় ছিল। তবে এই পট পরিবর্তনে 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ'-এর ওপর আস্থা একটা বড়ো ভূমিকা নিচ্ছে। এ মাসের শুরুতেই বিশ্বের ৮টি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, সুইডেন ও নরওয়ের প্রবীণ সংসদীয় আইন প্রণেতারা মিলে একটি যৌথ সংসদীয় ফোরামে তৈরি করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উপযুক্ত পন্থা ও নীতি নির্ধারণ করে কীভাবে একযোগে কৌশলগতভাবে চীন সংক্রান্ত বিষয়গুলির যথাযথ ও সময়োপযোগী মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়ে জোট তৈরি করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, বিশ্বে প্রচলিত পারস্পরিক বোঝাপড়ার বাতাবরণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে চীনের অর্থনৈতিক উত্থান প্রবল চাপ তৈরি করছে। এই পরিস্থিতির একক দেশ হিসেবে মোকাবিলা করা অত্যন্ত কঠিন। এ কারণেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী দেশগুলিকে একত্রিত করে তাঁরা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চান। মার্কিন রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাট সেনেটর উভয়ে, জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, ইউরোপীয় দেশগুলির সংসদ ও বিদেশ সংক্রান্ত প্রতিনিধি ও বৃহত্তম ব্রিটিশ Tory দলের নেতা এই মিলিত জোটের উল্লেখযোগ্য সদস্য।

অর্থনীতির প্রাচুর্যের দম্ভে চলতি 'করোনা মহামারী'র ক্ষেত্রে চীনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে বিশ্বের দেশগুলি এমন আশঙ্কা করছে যে, ভবিষ্যতে টাকা ছড়িয়েই চীন বিশ্বগ্রাসের পরিকল্পনা নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রকে মূল বাঁধন গ্রন্থি করে দেশগুলির ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে পারস্পরিক অবস্থানের নব নির্মাণই এই জোটের মূল লক্ষ্য। এই সূত্রে ব্রিটেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই নবগঠিত জোটে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করতে উদগ্রীব যাতে ৫-জি পরিষেবা নিয়ে চীনের সমগ্র বিশ্বের ওপর একাধিপত্য খর্ব করে বিকল্প সরবরাহকারীর ব্যবস্থা করা যায়। অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও চীনের যাঁতাকল থেকে বেরোতে দেশগুলি বদ্ধপরিকর।

> **বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্ষমতাবলয় তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে চীনের মুখোমুখি অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের বিদেশনীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক ভাবনাটিকেই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করতে হবে।**

মাত্র কয়েক মাস আগেই চীনের টেলিকম ক্ষেত্রে দৈত্যসম বিশাল সংস্থা 'হুহাই'কে ব্রিটেনে ৫-জি নেটওয়ার্ক বিস্তার করার বরাত দেওয়ার পরই বরিস জনসন সরকার ফাঁপরে পড়েছে। এই বরাত নাকচ করতে প্রবল চাপ আসছে। ইতিমধ্যেই ব্রিটেন চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের সমমনোভাবাপন্ন গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে একত্রিত করতে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। বিগত কয়েক মাস ধরে চীনের আচরণ ব্রিটেনকে এমন খোলাখুলিভাবে অন্য দেশগুলিকে নিয়ে চীনের বিরুদ্ধাচরণের পথে ঠেলে দিয়েছে।

অন্যদিকে আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরেই চীন বিরোধিতার নীতি নিয়েছে। অতি সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতি জি-৭ দেশগুলির আহূত সম্মেলন বাতিল করেছেন। আগামী মাসে এই সম্মেলন নির্ধারিত থাকলেও সেপ্টেম্বর অবধি বিলম্বিত করে তিনি অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়াকে এই সম্মেলনে অতিথি করতে চান। তাঁর এই নতুন পরিকল্পনার মূলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বর্তমান জি-৭ দেশগুলির সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং এই সংস্থা বহুকাল আগে তৈরি তাই বদল আনা যেতেই পারে এমন একটি মত কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।

এরই পরিপূরক ধাপ হিসেবে রাষ্ট্রপতি

ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ফোন করে জি-৭ এর পরবর্তী বৈঠকে আসার আমন্ত্রণ জানান। প্রত্যুত্তরে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মোদী ট্রাম্পকে ধন্যবাদ দিয়ে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে তাঁর এই দূরদর্শিতার প্রশংসা করে এই পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন। এই পরিকল্পনায় গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া বলবৎ থাকার যে আবশ্যিক শর্ত সত্ত্বেও রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তি চীনকে বেশ হতবাক করেছে। ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে চীনের সংবাদমাধ্যম তোলপাড় হচ্ছে। তারা ট্রাম্পের ফাঁদে পা দেওয়া নিয়ে ভারতের ওপরও বিষোদ্গার করছে। অবশ্য তারা তো সকলেই সরকারি মিডিয়া। চীন কিন্তু এই জোটবদ্ধতার অন্তর্নিহিত বার্তাটি পেয়ে গেছে। এই সূত্রে বিশ্বে বহুদেশীয় ভূমিকার গুরুত্ব ও অংশগ্রহণ নিয়ে ভারত দীর্ঘ ২ দশক ধরেই আওয়াজ তুলে আসছে। কেউ তাতে কর্ণপাত করেনি। কেবল ২০০৭-০৮-এর ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের সময় বেশি সংখ্যক দেশের অংশগ্রহণ নিয়ে জি-২০ গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে দেখা যায় এটি একটি সাময়িক বিচ্যুতি মাত্র। জি-২০ সক্রিয় ভূমিকা কখনই নিতে পারেনি।

বিশ্বব্যাপী বহুদেশীয় ফ্রন্ট তৈরির ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করা হয়। নিজস্ব আধিপত্য ধরে রাখতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প কখনই এতে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির সূত্রে বহুদেশীয় যোগসূত্রের কোনো স্থান তাঁর ভাবনায় আসতেই পারেনি। এরই পরিণতিতে তিনি বিশ্বের নানান বহুজাতিক ফোরাম ও সংস্থা থেকে আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন করতেই বেশি উৎসাহী ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে সুযোগসন্ধানী চীন নিজেকে বিশ্বত্রাতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। বিশ্বের ক্ষমতা বিন্যাসকে ধরে রাখতে তারাই প্রভু হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। ভবিষ্যতে বিশ্বের বহুদেশীয় ক্ষমতা বিন্যাসের প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক অনেকদিন ধরেই শুরু হয়।

আগে বলা পৃথিবীর অন্য কিছু দেশকে নিয়ে বহুদেশীয় শক্তি জোট তৈরি করার যে প্রসঙ্গ ভারত দু' দশক ধরে জোর দিয়ে আসছে তাতে তাল না মিলিয়ে বহু দেশ এটা ভাবছিল যে, চীন একটি দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে নিজেকে মেলে ধরবে। এই করোনা মহামারী সেই সমস্ত দেশকে সেই ভ্রান্ত নিদ্রা থেকে টেনে তুলেছে। সকলেরই নজরে পড়েছে করোনার প্রসঙ্গে চীনের দাপটে জি-২০, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ বা শক্তিধর হু (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) কেউই আন্তর্জাতিক স্তরে চীনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করতে পারেনি।

এরই অন্তিম পরিণতিতে আমরা এমন বিতর্কের পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে মিলিতভাবে প্রতিরোধের একটা পথ সন্ধান করতে সফল হচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ শক্তিধর দেশগুলি নতুন ফোরাম ও সংস্থা তৈরি করে চীনা চ্যালেঞ্জের পাল্লা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জারি থাকার বিষয়টি কেন্দ্রবিন্দু বলে বিবেচিত হচ্ছে। অতীতে চীনের সঙ্গে ভারতের মূলগত পার্থক্য বোঝাতে ভারত বার বার তার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কথা ব্যক্ত করেছে, আজ যা একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বহু দেশ এই বিন্দুটির ওপর প্রাপ্য গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উপসংহারে বলা যায়, বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্ষমতাবলয় তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে চীনের মুখোমুখি অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের বিদেশনীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক ভাবনাটিকেই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করতে হবে। বাস্তবে সরাসরি পক্ষ অবলম্বনের ঝুঁকি থাকলেও কৌশল ও পারদর্শিতায় তার মোকাবিলা ছাড়া অন্য পথ নেই।

(লেখক নয়া দিল্লির স্টাডিস অ্যাট অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর এবং লন্ডনের কিংস কলেজের আন্তর্জতিক সম্পর্ক বিষয়ক অধ্যাপক)

আমাদের পথপ্রদর্শক সুভাষ চন্দ্র নন্দী লোকান্তরিত

অরুণ দাস ।। গত ২৫ মে একটি ফোন 'আমাদের প্রিয় সুভাষদা আর নেই' আমাকে যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট করে দেয়। সুভাষ চন্দ্র নন্দী, যিনি কয়েক দশক উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগের অভিভাবক হিসেবে কখনো জেলার শারীরিক প্রমুখ, জেলা কার্যবাহ, শেষে বিভাগ সঙ্ঘচালক হিসেবে অত্যন্ত সুচারু রূপে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুভাষদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় পঞ্চাশ বছরের। তাঁর বাড়িতে স্বয়ংসেবকদের অবাধ যাতায়াত ছিল। কারণ তাঁর সম্পূর্ণ পরিবারই সঙ্ঘময়। তাঁর ভাই স্বর্গীয় গৌতম নন্দী সঙ্ঘের খুব ভালো কার্যকর্তা ছিলেন। দু'বছর আগে তিনি স্বর্গলাভ করেছেন। ১৯৮৪ সালে আমি যখন অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার শারীরিক প্রমুখের দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন সুভাষদা শারীরিক বিষয়ে বিভিন্ন রকমের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা নববর্ষের দিন তাঁরই প্রেরণায় জেলার স্বয়ংসেবকদের গণবেশ ও ঘোষবাহিনী তৈরি করে বসিরহাটে পথসঞ্চলন হয়। সেসময় তিনি কার্যকর্তাদের সক্রিয় ও উদ্দীপ্ত করেছিলেন।

প্রত্যেক কার্যকর্তার শাখা থাকতে হবে সেজন্য আমরা দুজনে সুশ্রুত শাখার সূচনা করি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত শাখা বন্ধ হয়নি। সুভাষদা বলেছিলেন, কেউ থাকুক না থাকুক আমরা দুজনে শাখা চালু রাখব। তাঁর নিষ্ঠা, কৌশল, পরামর্শ ও নেতৃত্বের জন্যে ওই শাখা বর্তমানে জেলার মধ্যে বিশেষ সুপরিচিত। এই শাখা থেকে তিন-চারটি নতুন শাখা শুরু হয়। ২০১৩ সালে কল্যাণীতে দক্ষিণবঙ্গের যুব শিবিরে তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে সর্বাধিক স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে একজন সৎ গৃহী কার্যকর্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন সুভাষদা।

তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরি করতেন। সঙ্ঘের কাজে অধিকাধিক সময় দেবার জন্য তিনি চাকুরি তে সাত-আটবার পদোন্নতিকে হেলায় অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর কাছে সঙ্ঘকাজ ছিল অপরিহার্য। সঙ্ঘের কাজে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র , ১ কন্যা, নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেলেন।

তিনি ছিলেন স্বয়ংসেবকদের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। তাঁর মৃত্যুতে জেলার স্বয়ংসেবকদের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। ঈশ্বরের কাছে প্রর্থনা করি তিনি যেখানেই থাকুন সেখান থেকেই যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন।

আক্রান্ত জগন্নাথদেব

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন, এই মন্দির যেন সহিষ্ণু হিন্দুধর্মের প্রতীক, যা বার বার বৈদেশিক আঘাত সত্ত্বেও নিশ্চিহ্ন হয়নি। পুরীর জগন্নাথ মন্দির দর্শন করে এমন মন্তব্য করেননি তিনি, তবে করতেই পারতেন। সোমনাথ মন্দিরের মতো জগন্নাথ মন্দির, জগন্নাথ বিগ্রহ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত যা বার বার বিজাতীয় বৈদেশিক আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। নৃশংসভাবে লাঞ্ছিত ও লুণ্ঠিত হয়েছে এবং আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

জগন্নাথদেব প্রথম আক্রান্ত হন ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় ওড়িশায় দুঃসময় ঘনিয়ে আসে। প্রথম এই আক্রমণে যে নেতৃত্ব দেন তার জন্ম-পরিচয় নিয়ে ইতিহাসে বিভিন্ন মত, বিতর্ক চালু থাকলেও সে কালাপাহাড় নামেই কুখ্যাত। এক মতে তার নাম কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভিন্ন মতে কালাচাঁদ ভাদুড়ি। পূর্ববঙ্গের অধুনা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হলেও সে রণনৈপুণ্যে দক্ষ ছিল। এই জন্য গৌড়ের আফগান সুলতান তাকে ফৌজদার করেন। সুদর্শন এই ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রণয়ে আবদ্ধ হয় সুলতান-তনয়া। ফলে, সে সুলতান কন্যাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয় এবং সুলতানের ইচ্ছায় তাকে ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে হয়। কথিত আছে, সে পুনরায় স্বধর্মে ফিরে যেতে চেয়েছিল, প্রায়শ্চিত্তেও ইচ্ছুক ছিল কিন্তু আচার সর্বস্ব প্রাণহীন সমাজপতিরা তাতে সম্মত হতে পারেননি। সমাজপতিদের এই গোঁড়ামির জন্য সে প্রতিশোধস্পৃহায় ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। সুলতানের সাগ্রহ সম্মতি নিয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পথের দু'ধারের মন্দির, মঠ ধ্বংস করতে করতে সে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছয়।

সে সময় ওড়িশার রাজা ছিলেন মুকুন্দদেব। তিনি বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। কালাপাহাড় মন্দিরের ধন-রত্ন লুঠ করে, মন্দির তছনছ করে জগন্নাথ বিগ্রহ নিয়ে বাইরে আসে। হাতির পিঠে চামড়ার দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বিগ্রহ বাঁধা হলো। তার পর বিগ্রহ চলল সমুদ্রের তীরে। হাতি চলেছে বিগ্রহ নিয়ে। পেছনে চলেছে অগণিত যবন সৈন্য। তাদের আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে শ্রীক্ষেত্রের আকাশ- বাতাস মুখরিত। হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন অদ্ভুত এক পুরুষ। দীর্ঘ শীর্ণকায় অস্থিচর্মসার। মাথায় পাগড়ি। পরনে কেবল হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। গলায় ঝুলছে মৃদঙ্গ। উন্মত্ত যবন সেনাদের পেছনে পেছনে কিছুটা দূরত্ব রেখে তিনিও চলেছেন মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে। এই পুরুষের নাম বিশরা মহান্তি।

সমুদ্রের তীরে একটা স্থানে হাতি থামল। কাঠের উপর কাঠ সাজিয়ে চিতা সাজানো হলো। জগন্নাথ হিন্দু দেবতা। তাঁর সৎকারও হবে হিন্দু মতে। তাই চিতা জ্বলে উঠল লেলিহান শিখায়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, অনেকক্ষণ ধরে জ্বললেও বিগ্রহ পুরোপুরি ভস্মীভূত হলো না।

কালাপাহাড় অধৈর্য হয়ে অর্ধদগ্ধ বিগ্রহ ফেলে দিয়ে তার বাহিনী নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। কিছু দূরে সবার অলক্ষে অপেক্ষা করছিলেন আর মৃদঙ্গ বাজাচ্ছিলেন বিশরা। তিনি যেন এই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। যবনসৈন্য সরে যেতেই তিনি দারুবিগ্রহ থেকে জগন্নাথের আত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম উদ্ধার করে মৃদঙ্গের খোলের ভিতর ভরে নিয়ে চলে এলেন কটকের কাছে কুজাঙ্গায়। বিশরা মহান্তির আনা ব্রহ্ম মহানদীর ব-দ্বীপে কুজাঙ্গায় অনাড়ম্বরভাবে পূজিত হতে লাগল।

১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশায় রাজনৈতিক পালাবদল হলো। সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ওই বছর ওড়িশা আক্রমণ করে আফগানদের বিতাড়িত করলেন। এর ফলে ওড়িশায় রাজনৈতিক, সামাজিক কিছুটা সুস্থিতি ফিরে এল। ভাঙাচোরা মন্দিরগুলির সাধ্যমতো সংস্কার হতে লাগল, পুজোপাঠও শুরু হলো।

ওড়িশার সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছেন 'ভৈ' বংশের রামচন্দ্রদেব। রাজসিংহাসনে রাজা বসলেও 'রত্নবেদি' যে বিগ্রহ-শূন্য। জগন্নাথহীন। ওড়িশায় একটা কথা চালু আছে, ওড়িশার অন্য নেতার নহিক প্রয়োজন। ওড়িশার নেতা স্বয়ং নারায়ণ, সেই নারায়ণই নেই। তাই প্রজাদের মনে নিরানন্দ।

রামচন্দ্রদেব তখন যত্ন নিলেন জগন্নাথদেবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। তিনি মানসিংহের অনুমতি নিয়ে শাস্ত্রসম্মত বিধি অনুযায়ী উপযুক্ত দারুর সন্ধানে লোকজন প্রেরণ করলেন। সিংহল ব্রহ্মপুরের কাছে

দারুবিগ্রহের বৃক্ষ মিলল। রত্নবেদিতে নবকলেবরে জগন্নাথ আবার প্রতিষ্ঠিত হলেন, সেই ব্রহ্মবস্তু যা কুজাঙ্গায় পূজিত হচ্ছিল তা স্থাপিত হলো জগন্নাথের হৃদিকন্দরে। স্বভাবত ধর্মপ্রাণ মানুষ খুশি হলো তাদের প্রাণের দেবতাকে ফিরে পেয়ে।

কিন্তু এই আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। ১৬০৭ সালে ওড়িশা মোগল সাম্রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র সুবা বা প্রদেশের মর্যাদা পেল। কটক হলো সুবাসদর। সুবাদার হাসিম খানের জায়গিরদার রাজপুত কেশো দেও মারু রথযাত্রার দিনে উৎসবের মধ্যে পুরী আক্রমণ করে রথগুলিকে পুড়িয়ে দিল। তাণ্ডব থেকে বিগ্রহও রেহাই পেল না। অসংখ্য মানুষ নিহত হলো। অবাধে লুণ্ঠন চলল। উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে হাহাকারে পরিণত হলো।

আঘাত ও অত্যাচারে মানুষ মুষড়ে পড়লেও কিছুদিন পর আবার নব উদ্যামে মন্দিরের সংস্কার করে জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের তত্ত্বাবধানে গোপনে মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পুজোপাঠ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তিন বছর পর ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে আবার শ্রীমন্দিরে আঘাত নেমে এল। এবার হামলার নেতৃত্বে স্বয়ং সুবাদার কল্যাণ সিংহ। কিন্তু মন্দির আক্রান্ত হলেও বিগ্রহত্রয় অক্ষত থেকে যায় সেবায়েতদের সক্রিয়তায়। তাঁরা খবর পেয়েছিলেন, কল্যাণ সিংহ আসছেন মন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস করতে। তাঁরা বিলম্ব না করে বিগ্রহ নিয়ে চলে যান চিল্কার জনহীন দ্বীপে।

১৬২৭ সালে দিল্লির মসনদে বসেন শাজাহান। ওড়িশার সিংহাসনে বসেছেন পুরুষোত্তমদেবের পর নরসিংহদেব। কিন্তু মন্দিরে দেবতা নেই। দীর্ঘদিন ধরে জগন্নাথদেব মন্দির থেকে দূরে চিল্কার কোনো দ্বীপে সংস্থিত। নরসিংহদেব জগন্নাথ প্রতিষ্ঠার জন্য বার বার সম্রাট শাজাহানের কাছে দরবার করেন, সঙ্গে নিয়ে যান আকর্ষণীয় ভেট।

দীর্ঘদিন ধরে কাতর আবেদনের পর শাজাহানের সম্মতি মিলল। পুনরায় জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত হলেন রত্নবেদিতে। জগন্নাথকে ফিরিয়ে আনার কৃতিত্বে নরসিংহদেব ওড়িশায় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। এই জনপ্রিয়তার ফলে তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং জীবনহানি ঘটে। এরপর ওড়িশায় নেমে আসে অরাজকতা। হত্যা-প্রতিহত্যায় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে শ্রীক্ষেত্রের মৃত্তিকা। দীর্ঘ টালবাহানার শেষে অনিশ্চয়তার অধ্যায় অতিক্রম করে ওড়িশায় রাজা হন দিব্যসিংহদেব (১৬৮৯ থেকে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দ)। সেই সময় দিল্লির মসনদে চরম হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী আওরঙ্গজেব। তিনি অসংখ্য বিগ্রহ ধুলিসাৎ করছেন ক্রুদ্ধ পরধর্ম বিদ্বেষে। যখন তিনি দক্ষিণ ভারতে তখন হিন্দুজনমানসে জগন্নাথদেবের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হন। এরপর তিনি আর দেরি করলেন না, সুবেদার এক্রাম খাঁকে এই কাজে পাঠানো হলো। বাদশার ইচ্ছে, কাফেরদের ঘৃণিত পুতুলগুলি তার কাছে এনে দিতে হবে।

১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে এক্রাম ও তার ভাইয়ের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী জগন্নাথধাম ঘিরে ফেলল। প্রথমে যবনবাহিনী মন্দিরের মধ্যে পৈশাচিক উল্লাসে দাপাদাপি করে লুঠপাট চালাল, তারপর এক্রাম খাঁ চলল গর্ভগৃহের দিকে।

সেই সময় দিব্য সিংহ তাঁকে নিরস্ত করার জন্য নিবেদন করলেন— দিল্লির বাদশাহ বিগ্রহগুলি চেয়েছেন, তিনি নিজের হাতে বিগ্রহগুলি তুলে দেবেন। এর অন্যথা হবে না। কিন্তু তাড়াহুড়োর দরকার কী? তাঁরা সুদূর দিল্লি থেকে এসেছেন, তাঁরা এই রাজ্যের অতিথি, মাননীয় মেহমান, কাজেই রাজার অতিথিশালায় বিশ্রাম নিন দু'দিন। তাদের আদর আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হবে না। তারপর বিগ্রহ নিয়ে বাদশাহের কাছে যাবেন।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সৈন্যবাহিনীর মতোই এক্রাম ও তারর ভাইও পথশ্রমে ক্লান্ত। একটু জিরিয়ে নিলে খারাপ হয় না, বিশেষ করে রাজ অতিথিশালায় আশা করা যায় আদর যত্নের কোনো খামতি হবে না। আপাতত এক্রাম তার কাজ স্থগিত রাখলো। তারা সানন্দে রাজার অতিথিশালায় এল। সঙ্গের তাদের পারিষদবর্গ আর সেনাবাহিনী চলল সেনাছাউনিতে।

এক্রাম ভাইযেরা যেমন ভেবেছিল রাজা দিব্যসিংহ বরং তার বেশিই আয়োজন করেছেন। পান-ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা। সুরার সঙ্গে সুন্দরীও। আজ ভারত তথা এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার মানুষ পুরী যান। জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখর হন। সমুদ্রে স্নান করেন। কিন্তু ক'জন বাঙ্গালি খবর রাখেন-- জগন্নাথদেবের কথা ভেবে সুন্দরী যুবতীরা সানন্দে এক্রাম ভাই ও তাদের পার্ষদের দেহদান করে রাজার অতিথিশালায় ইচ্ছা করে আটকে রেখেছিলেন!

এক্রামভাইয়েরা যখন সুরা ও সুন্দরীতে আসক্ত, রাজার শিল্পীরা তখন গোপনে নিভৃতে নকল বিগ্রহ নির্মাণে ব্যস্ত। শিল্পীদের দিনরাতের পরিশ্রমে চন্দনকাঠের নকল বিগ্রহ তৈরি হলো। রাজকোষ থেকে মুক্তো এল। সেই মুক্তো দিয়ে তিনিটি বিগ্রহের উজ্জ্বল চকচকে চোখ হলো। ততদিনে আসল বিগ্রহগুলিকে যবনবাহিনীর অলক্ষ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে চিল্কাহ্রদের দূর দুর্গম নির্জনতায়। এক্রামভাইদের হাতে দিব্য সিংহ নকল বিগ্রহগুলি তুলে দিলেন। তারা বিগ্রহ পেয়ে খুব খুশি। সেই বিগ্রহগুলি তারা নিয়ে চলে গেল। বীজাপুরে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাতে তুলে দিতে। আওরঙ্গজেব নিজের হাতে পৈশাচিক উল্লাসে বিগ্রহ তিনটির মুক্তোর চোখ খুবলে তুলে নিলেন, তারপর বিগ্রহগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন।

রাজা দিব্য সিংহের বুদ্ধিতে এবং কয়েকজন সুন্দরী যুবতীর আত্মত্যাগে সেবার জগন্নাথদেব রক্ষা পেলেন। কিন্তু তারপরও আক্রমণের ধারা অব্যাহত থেকেছে। ওড়িশার জনজীবনও বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ওড়িশা রাজ্যটি ব্রিটিশদের অধিকারে আসার পর জগন্নাথের উপর আক্রমণ ও লুণ্ঠনে ছেদ পড়ে। ১৮০৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের পর আর কোনো লুঠেরা বা পরধর্ম বিদ্বেষী সিংহদ্বার অতিক্রম করার সাহস পায়নি।

জগন্নাথদেবের ওপর এই যে বার বার অত্যাচার হয়েছে, কখনও প্রভুর বিগ্রহ টুকরো টুকরো হয়েছে, কখনো আগুনে পুড়েছে, কখনো মাটির তলায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই জঘন্য কুৎসিত আক্রমণের মধ্যে প্রথম তিন আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় তিন হিন্দু সন্তান।

এর মতো লজ্জা আর কী আছে! এই কাজ আত্মবিস্মৃত হিন্দুর পক্ষেই হয়তো সম্ভব।

পরম্পরা

একটি কৃষি উৎসব আজ শুধুই ধর্মীয় অনুষ্ঠান

নন্দলাল ভট্টাচার্য

হিন্দুর প্রায় প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানের পেছনেই ক্রিয়াশীল কোনো না কোনো আর্থ-সামাজিক ভাবনা। একটু নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওইসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নয়, লোকায়ত দর্শনই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কেবল কিছু সংস্কার— 'সু' অথবা 'কু' এর পেছনে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে তা নয়, এগুলির পেছনে কাজ করেছে এক ধরনের বিজ্ঞানমনস্কতাও। কিন্তু কোনো সময়েই সেগুলি বিজ্ঞানের নামে করার কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞান সম্পর্কে এই আপাত উদাসীনতার কারণেই বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সমালোচকরা হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানকে ঢালাও ভাবে কুসংস্কার বলে আখ্যাত করে নিজেদের সভ্যতার বড়াই করে থাকেন।

হিন্দুর এমনই একটি অনুষ্ঠান অম্বুবাচী। বর্তমানে এর ধর্মীয় রূপটি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র, স্মৃতিগ্রন্থ ইত্যাদির অনুশীলনে জানা যায়, অম্বুবাচী সংক্রান্ত ধর্মীয় বিধিনিষেধ ইত্যাদি সবই পরবর্তীকালের আরোপিত। যেমন, বর্তমানে প্রচলিত ধারণা, অম্বুবাচীর সময় পৃথিবী রজঃস্বলা হয়। তাই ধরিত্রী হয় অশুচি। কিন্তু এ ব্যাপারে রঘুনন্দনের ঠিক পূর্ববর্তী স্মৃতিকার গোবিন্দানন্দ একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর 'বর্ষক্রিয়ামৌমুদী' গ্রন্থে। বলেছেন, ভূমেরশুদ্ধি: কৃত:— আধুনিকরা বলেন, এই সময় পৃথিবী অপবিত্র হয়। কিন্তু বাস্তবে তা হতে পারে না। কারণ সত্যিই যদি পৃথিবী অশুদ্ধ-অপবিত্র হতো, তাহলে খাওয়া-দাওয়া সমস্তই নিষিদ্ধ হতো।

গোবিন্দানন্দর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, অম্বুবাচীর সময় পৃথিবী অপবিত্র হয় এই ধারণা প্রাচীনকালে ছিল না। এটা সম্পূর্ণভাবেই আধুনিক বা পরবর্তীকালের সংযোজনা।

দ্বিতীয় যে সত্যটি এই বক্তব্য থেকে উঠে আসে, তাহলো অম্বুবাচীর সময় খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে কোনো নিষেধই ছিল না। এটিও সম্ভবত পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কোনো স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নির্দেশ।

যাইহোক, এই বক্তব্যের আলোয় অম্বুবাচীর উৎসসন্ধানে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, ভারত মূলত কৃষিভিত্তিক দেশ। কৃষিই এদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। সেই ভিত্তিকে মজবুত করতে

এবং এই কৃষিজীবিকার সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থেই অম্বুবাচীর মতো অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয় একসময়।

আষাঢ়ের নববর্ষার সূচনায় মূলত দেশের কৃষক সমাজ এবং কৃষিজমিকেও কিছুটা বিশ্রাম দেওয়ার অভিপ্রায়েই এই অম্বুবাচীর আয়োজন। বঙ্গদেশে মূলত ৭ আষাঢ় থেকে তিনদিন এবং ওড়িশায় জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে তিনদিন অম্বুবাচী পালিত হয়। ওড়িশায় অম্বুবাচীর নাম রজউৎসব।

প্রাচীন যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যায়, নববর্ষায় কৃষককুল নতুন উদ্যমে কৃষিকর্ম শুরুর আগে যাতে নিজেরা সুস্থ থাকতে পারে, নানা আনন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সৃজনশক্তি অর্জন করতে পারে, তারই জন্য সমাজকর্তারা অম্বুবাচীর মতো একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন। ওই সময় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ তো ছিলই না, বরং বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হতো। বনভোজনের মতো অনুষ্ঠান, লোকনৃত্য, গান বাজনারও আয়োজন করা হতো, এখন অনুষ্ঠানও করেন অনেকে।

এক সময় যা ছিল সম্পূর্ণভাবেই একটি লৌকিক অনুষ্ঠান পরবর্তীকালে কী করে তার সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান যুক্ত হয় তা সঠিকভাবে নির্দেশ করা এখন খুবই কঠিন। তারচেয়েও বড়ো কথা, লক্ষ্যের চেয়েও উপলক্ষ্যই এখন যেন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে সমাজের পতিহীনাদের উপর এ যেন এক নির্যাতন। বিধবাদের ক্ষেত্রে যেন এক নির্মম আচার হিসেবে আয়োজিত হয়েছে। এক সময় বিধবাদের নির্জলা একাদশীর উপবাস পালনে বাধ্য করে তাদের উপর একধরনের সামাজিক নির্যাতন চালানো হতো। অম্বুবাচীও যেন অনেকটা সেই জায়গায়ই নিয়েছে। এই তিনদিন বিধবাদের উনুন জ্বালানো নিষেধ। রান্না করা সবরকম খাবার খাওয়া বারণ। ফলমূল খাওয়া যায়, কিন্তু সেটাও যেন না খেলেই ভালো হয় এমন মানসিকতাও কাজ করে কোনো কোনো সময়।

তবে শুধু বিধবা নয়, কোনো কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, যতি ও সন্ন্যাসীও অম্বুবাচী পালন করেন ব্রত হিসেবে। কিন্তু বিশেষ করে বিগত শতকেও অম্বুবাচী যেন এক আত্মনিগ্রহের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

প্রাথমিক পর্বে অম্বুবাচীর সঙ্গে পূজার্চনার তেমন একটা ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ করে দেবী কামাখ্যার সঙ্গে অম্বুবাচীর যেন এক অতি ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়। অসমে কামাখ্যা পাহাড়ে দেবী কামাখ্যার মন্দিরে এই সময় বিরাট মেলা বসে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তদের সমাবেশ ঘটে এই সময়। দেবীর মন্দির কিন্তু বন্ধ থাকে এই তিনদিন।

কামাখ্যা মন্দিরের মতোই এখন দেশের বিভিন্ন ছোটো বড়ো মন্দিরেও অম্বুবাচীর মেলার আয়োজন করা হয়। অম্বুবাচী বলতে সকলেই এখন কামাখ্যা দেবীর মেলা এবং বিধবাদের খাওয়া-দাওয়ায় নিষেধের কথাটিই জানেন। অম্বুবাচীর প্রকৃত পরিচয়টি যেন হারিয়ে গেছে এই ধরনের উৎসব ও ব্রত অনুষ্ঠানের আড়ালে। লৌকিক জীবনে অম্বুবাচীর গুরুত্ব বা বিশেষ ভূমিকার কথা এমনকী কৃষকরাও প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন।

অবশ্য এটাই যেন কিছুটা স্বাভাবিক, এক সময় ভারতের কৃষি ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর। সে সময় পয়লা আষাঢ় ওই দেশে বর্ষা আসত এবং তার ওপর নির্ভর করেই হতো চাষাবাদ। কিন্তু এখন সব দিক থেকেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমত ঋতুচক্রের যে পরিবর্ত এসেছে তাতে এখন আর পয়লা আষাঢ় থেকে বর্ষার শুরু হয় না। বরং প্রকৃত বর্ষা আসতে আসতে শ্রাবণ এসে যায়। তাই আষাঢ়ের গোড়ায় অম্বুবাচী পালনের তৎকালিক গুরুত্ব অনেকটাই কমে গিয়েছে। তাছাড়া, এখন কৃষি আর শুধু বৃষ্টি নির্ভর নয়। বরং নানা ধরনের সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে সারা বছর ধরেই চলে কৃষিকর্ম। তাই বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকদের ছুটি দেওয়ার যে তাৎপর্য তাও হারিয়ে গেছে অনেকটাই। এবং এসব কারণেই বাঙ্গলার কৃষক ও লৌকিক জীবন থেকে অম্বুবাচী যেন হারিয়ে গিয়েছে।

লৌকিক জীবনে অম্বুবাচীর তাৎপর্য হ্রাস পেলেও ধর্মীয় দিক থেকে অম্বুবাচী আবার যেন নতুন এক ধরনের গুরুত্ব অর্জন করেছে। তন্ত্রসাধনা এবং দেবী আরাধনার প্রচলিত মার্গে অম্বুবাচী নতুনভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এই সামাজিক বিবর্তন অম্বুবাচীর মতোই হিন্দুর বহু আচার অনুষ্ঠানকে আমাদের কাছে পরিবর্তিত রূপে তুলে ধরেছে। বলতে কী, এই বিবর্তন এবং সমন্বয়ই হিন্দু ধর্মের প্রাণ প্রবাহকে নিত্য বহমান রেখেছে। ■

লৌকিক জীবনে অম্বুবাচীর তাৎপর্য হ্রাস পেলেও ধর্মীয় দিক থেকে অম্বুবাচী আবার যেন নতুন এক ধরনের গুরুত্ব অর্জন করেছে। তন্ত্রসাধনা এবং দেবী আরাধনার প্রচলিত মার্গে অম্বুবাচী নতুনভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

কামাখ্যা মহাপীঠের ইতিবৃত্ত

জহরলাল পাল

কোচবিহার রাজ্যের অধিপতিগণ শিববংশীয় বলে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে কোচ রমণীর গর্ভে মহাদেবের ঔরসে বিশু ও শিশু নামে দুটি বালক জন্মগ্রহণ করে। তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বাহুবলে জন্মস্থানের আধিপত্য লাভ করেন। অতপর বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ নাম ধারণ পূর্বক ক্রমশ রাজ্যের বিস্তার করতে গিয়ে সমগ্র কামরূপ প্রদেশের অধিশ্বর হয়ে ওঠেন। বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করে শিবসিংহকে রাজ্যের প্রধান আমাত্য হিসেবে নিযুক্ত করেন। বিশ্বসিংহের রাজত্বকাল ছিল ১৫০৯ থেকে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মহাদেবের ঔরসজাত কোচবিহার রাজবংশের আদিপুরুষ এই বিশ্বসিংহ মহারাজই কামাখ্যা মহাপীঠ পুনরুদ্ধার করেন। এই বিষয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরকৃত 'আসাম বুরঞ্জি' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

বিশ্বসিংহ রাজা হয়ে প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কামতাপুর রাজ্য এবং অন্যান্য মেছ ও কোচজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে পরাস্ত করে তিনি ও তাঁর ভ্রাতা উভয়েই উজাইয়া গুয়াবাটীর দিকে অগ্রসর হন। একদিন দুইভাই নীলাচল পর্বতে এসে উপস্থিত হন। পর্বতের কোনো এক স্থানে একটি মাটির ঢিবি ছিল। সেখানে মিলিত হওয়া লোকদের কাছ থেকে ভ্রাতৃদ্বয় বুঝতে পারলেন যে, ঢিবির নীচে এক জাগ্রত দেবতা আছেন। তাঁরা দেবতার মাহাত্ম্য অবগত হলেন এবং বুঝতে পারলেন স্থানটি একটি শক্তিপীঠ। বিশ্বসিংহ তখন সংকল্প করলেন যে, যদি তাঁর দেশ সুস্থির হয় এবং রাজ্য নিষ্কণ্টক হয় তবে শক্তিপীঠে সোনার মন্দির তৈরি করে দেবেন। রাজা নিজ রাজ্যে ফিরে আসার পর ক্রমশ দেশ সুস্থির হলো। তিনি সমস্ত পণ্ডিতকে আহ্বান করে সেই দেবস্থানের বিষয় অনুসন্ধান করাতে তা কামাখ্যা পীঠস্থান বলে জানলেন। অতপর রাজা সেই স্থানেই মন্দির নির্মাণ করলেন এবং সোনার মন্দিরের পরিবর্তে প্রতি ইস্টকখণ্ডে একরতি করে সোনা রেখে নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করলেন। বিশ্বসিংহ যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তা ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। তখন বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ কামরূপ প্রদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভগ্ন মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেছিলেন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সংস্কার কার্যের সূচনা করে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন করে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। অদ্যাবধি নরনারায়ণের কীর্তিখ্যাপক একটা প্রস্তরফলক কামাখ্যা মন্দিরের দ্বারদেশে বিদ্যমান রয়েছে। মন্দিরের ভিতরে মহারাজের ও তাঁর ভ্রাতা সেনাপতি শুক্লধ্বজের মূর্তিদ্বয় তাঁদের কীর্তি-কাহিনির সাক্ষ্যদান করছে।

কোচবিহার অধিপতিগণের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে প্রথমাবস্থায় মা কামাখ্যার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ হলেও পরবর্তীতে তাঁদের সঙ্গে দেবীর বড়ো একটা সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়নি। এমনকী মহাপীঠে এসে সেই বংশের কেউ দর্শন,স্পর্শন, এমনকী পূজাদিও নিবেদন করতে আসেননি। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবাদ বিদ্যমান। মা কামাখ্যার পূজা পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাজা নরনারায়ণ নিজ রাজ্য কোচবিহার থেকে ব্রাহ্মণ এনে নিযুক্ত করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেন্দুকলাই নামক পূজারি ব্রাহ্মণ। কোনো এক অলৌকিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কেন্দুকলাই ব্রাহ্মণ দ্বারা কোচবিহারের রাজপরিবারের সদস্যরা দেবী দর্শনে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ভিন্ন মতে নরনারায়ণ স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে এরূপ নিষেধের অধীনতা প্রাপ্ত হন। অন্যভাবে কেউ কেউ অনুমান করছেন, শিবভক্ত কোচ রাজারা শক্তিপীঠের মাহাত্ম্য নিয়ে ক্রমে ক্রমে উদাসীন হয়ে পড়েন। ফলে রাজা ও রাজার পরিবারের লোকেরা নীলাচলের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বিরত থাকেন এবং ছত্রদ্বারা আড়াল করে যাতায়াত করে চলেন। এই অবস্থায় কোচবিহার অধিপতিগণ যে কামাখ্যা মাতার সেবাপূজা বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবেন তা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষত কালক্রমে কামাখ্যাধাম তাঁদের রাজ্যের সীমার বহির্ভূত হয়ে পড়েছিল। অসমের অধিপতি আহোম জাতীয় ইন্দ্রবংশীয় রাজগণ কর্তৃক এই স্থান অধিকৃত হয়। তাঁদের মধ্যে স্বর্গদেব গদাধর সিংহ, রুদ্র সিংহ ও শিবসিংহের সময়ে রাজপরিবারের শাক্তধর্মের প্রতি সবিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। রুদ্র সিংহ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নদীয়া-শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণরাম সার্বভৌম নামে একজন সাধক মহাপুরুষকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। কামাখ্যা ও কামরূপের অন্যান্য দেবালয়ে এখন পর্যন্ত যেরূপ পূজাবিধি প্রচলিত আছে এই কৃষ্ণরাম কর্তৃক তা প্রবর্তিত হয়েছিল। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, কামাখ্যা মহাপীঠ কোচবিহার অধিপতিগণের দ্বারা প্রথমত পুনরুদ্ধার এবং সেবিত হলেও অবশেষে তাঁরা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করায় আহোমবংশীয় রাজগণই ক্রমশ এই পীঠের সেবা-পূজার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ∎